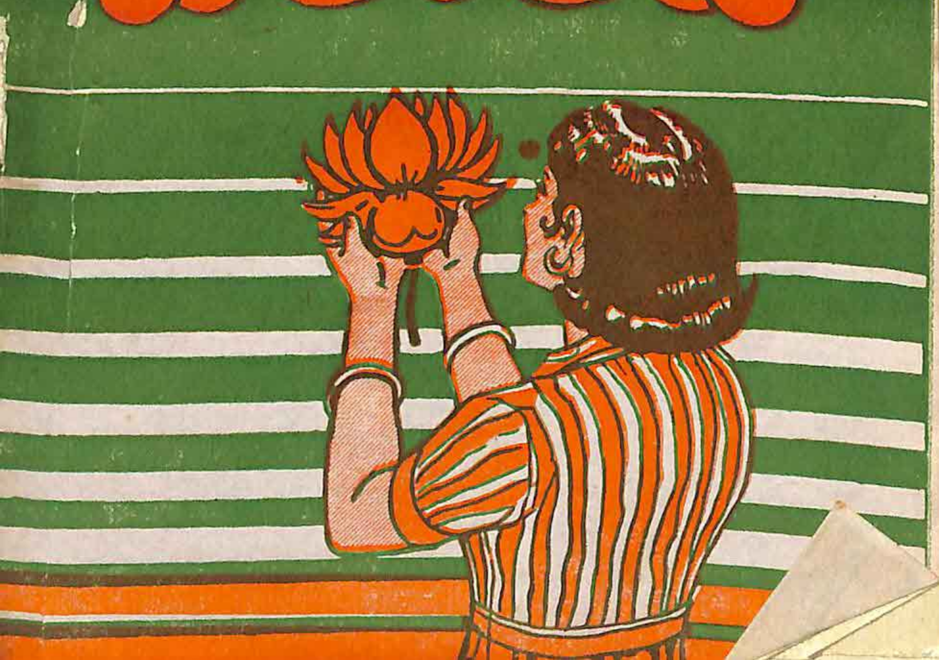
রচনা সোপান



পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার কর্তৃক নব প্রবর্তিত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী
পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় সমূহের
তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য লিখিত—১৯৮৮

রচনা সোপান

৪'৪

৭৬৬

[তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর জন্য]

766

অজয় ঘোষ

আশা বুক এজেন্সী
৮এ, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

প্রকাশিকা ঃ
ঝর্ণা দত্ত
৮এ, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মূল্য ঃ ছয় টাকা মাত্র

মুদ্রাকর ঃ
নারায়ণ প্রেস
১০৭/২, রাজা রামমোহন সরণী
কলিকাতা-৯

ভাষা নির্ভুল ভাবে বলিবার বা লিখিবার জন্য যে বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করিতে হয় সেই বিষয়ের নাম ব্যাকরণ। বাংলা, ইংরাজী, হিন্দী, সংস্কৃত ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষা পৃথিবীতে আছে। প্রতি ভাষারই **ব্যাকরণ** আছে।

ভাব ও ভাষা

আমরা মনে মনে যাহা ভাবি তাহাই হইল ভাব। মনের ভাবকে আমরা যখন কতকগুলি শব্দে গুছাইয়া প্রকাশ করি তখনই তাহা হয় ভাষা।

সাধারণতঃ আমরা বলিয়া এবং লিখিয়া এই দুইভাবে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারি। বলিয়া মনের ভাব প্রকাশ করাকে বলে **কথ্য ভাষা** এবং লিখিয়া মনের ভাব প্রকাশ করাকে বলে **লেখ্য ভাষা**।

কথ্য ভাষা এবং লেখ্য ভাষা আবার দুই প্রকারের। যথা, **সাধু ভাষা** ও **চলতি ভাষা**।

সাধুভাষা—আমি ভাত খাইব।

চলতি ভাষা - আমি ভাত খাবো।

বাংলা ব্যাকরণ

যে পুস্তক পাঠ করিলে বাংলা ভাষা শুদ্ধ রূপে বলিতে ও লিখিতে পারা যায় তাহাকে **বাংলা ব্যাকরণ** বলে।

বর্ণ বা অক্ষর

আমাদের মনের ভাব লিখিয়া প্রকাশ করিতে কতকগুলি চিহ্নের

প্রয়োজন হয়, এই চিহ্নগুলিকেই বর্ণ বলে। যথাঃ—অ, ক, খ, গ ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় সর্বমোট ৪৮টি বর্ণ বা অক্ষর আছে। ইহাদের বলে বর্ণমালা। বর্ণমালা দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ।

যে বর্ণগুলি অন্য বর্ণের সাহায্য ব্যতীত উচ্চারিত হয়, তাহাকে স্বরবর্ণ বলে। স্বরবর্ণ মোট ১২টি। যথা—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ। স্বরবর্ণগুলি দুই ভাগে বিভক্ত। যথা—হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বর।

যে স্বরবর্ণগুলি উচ্চারণ করিতে অল্প সময় লাগে, তাহাকে হ্রস্বস্বর বলে। যথা—অ, ই, উ, ঋ, ঌ।

যে স্বরবর্ণগুলি উচ্চারণ করিতে বেশী সময় লাগে, তাহাকে দীর্ঘস্বর বলে। যথা—আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ।

যে সকল বর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতীত উচ্চারিত হয় না, তাহাকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে। ব্যঞ্জনবর্ণ মোট ৩৫টি ; যথা—ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্, চ্, ছ্, জ্, ঝ্, ঞ্, ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ণ্, ত্, থ্, দ্, ধ্, ন্, প্, ফ্, ব্, ভ্. ম্, য্, র্, ল্, ব্, শ্, ষ্, স্, হ্, ং, ঃ।

ক হইতে ম পর্যন্ত ২৫টি ব্যঞ্জনবর্ণ পাঁচ ভাগে বিভক্ত। ইহাদের এক এক ভাগকে বর্গ বলে। যথাঃ—

ক বর্গ	ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্ ;
চ বর্গ	চ্, ছ্, জ্, ঝ্, ঞ্ ;
ট বর্গ	ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ণ ;
ত বর্গ	ত্, থ্, দ্, ধ্, ন্ ;
প বর্গ	প্, ফ্, ব্, ভ্, ম।

অনুশীলনী

১। ভাষা কাহাকে বলে? ২। বাংলা ব্যাকরণ বলিতে কি বোঝ? বর্ণ কত প্রকার এবং কি কি? ৩। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে পার্থক্য কি?

পদ বা শব্দ

একটি বর্ণ কিংবা কতকগুলি বর্ণ একত্রে যুক্ত হইয়া যদি কোন অর্থ প্রকাশ করে, তাহাকে **পদ** বা **শব্দ** বলে। যথা—মা, রাম, মহাভারত ইত্যাদি।

এ, ঐ, ও ইহারা তিনটি পৃথক বর্ণ হইলেও তিনটি পৃথক শব্দ। কারণ ইহাদের প্রত্যেকে কোন না কোন অর্থ প্রকাশ করে। যেমন—এ কাজ তোমার করা ঠিক হয় নাই। ও কথা আমার জানা আছে। ঐ লোকটিকে আমি চিনি।

অথবা একাধিক বর্ণ মিলিয়া যদি কোন অর্থ প্রকাশ করে তাহা হইলে ঐ বর্ণ সমষ্টিকে শব্দ বলা হয়, যেমন—

ব, ল = বল	অ, ত = অত
ব, ই = বই	আ, ম = আম
ক, ল, ম = কলম	স, ক, ল = সকল
অ, জ, গ, র = অজগর	ক, ল, র, ব = কলরব

ইত্যাদি বিভিন্ন শব্দ গঠিত হয়।

বাক্য

কয়েকটি শব্দ একত্রে মিলিত হইয়া যদি একটা সম্পূর্ণ অর্থ বা মনের ভাব প্রকাশ করে তবে তাহাকে **বাক্য** বলে। যথা—

হরি সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া খেলা করে।

বাক্য দুই ভাগে বিভক্ত। যথা—উদ্দেশ্য ও বিধেয়।

যাহার সম্বন্ধে কোন কিছু বলা হয় তাহাকে **উদ্দেশ্য** বলে এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা বলা হয় তাহাকে **বিধেয়** বলে। যথা—রাম বল খেলিতেছে। এই বাক্যটিতে রামের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, সে বল খেলিতেছে। এখানে রাম উদ্দেশ্য এবং রাম কি করিতেছে? 'বল' খেলিতেছে। সুতরাং বল খেলিতেছে বিধেয়।

অনুশীলনী

১। বাক্য কাহাকে বলে? উদাহরণ দাও।

২। বাক্যের কয়টি অংশ এবং কি কি?

৩। উদ্দেশ্য ও বিধেয় বাহির কর।

শীলা বই পড়ে। জীবন স্কুলে যাইতেছে। মেয়েরা মারামারি করিতেছে।

পদ

পদ পাঁচ প্রকার, যথা ঃ—(১) বিশেষ্য (২) বিশেষণ (৩) সর্বনাম (৪) অব্যয় ও (৫) ক্রিয়া।

বিশেষ্য পদ

যে পদের দ্বারা কোন ব্যক্তি, বস্তু, জাতি, গুণ ও কার্যের নাম বুঝায়, তাহাকে **বিশেষ্য** পদ বলে। যথা—

বিধানচন্দ্র বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। সোনা মূল্যবান ধাতু। মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ দয়া। শয়নের পূর্বে ভগবানের নাম করিবে।

উপরের বাক্যগুলির মধ্যে বিধানচন্দ্র, সোনা, মানুষ, দয়া, শয়ন ইত্যাদি—প্রত্যেকেই বিশেষ্য পদ।

যে পদ দ্বারা বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের দোষ, গুণ, অবস্থা প্রকাশ করে তাহাকে **বিশেষণ** পদ বলে। যথা—রাম ভাল ছেলে। দুষ্ট লোকের সহিত মিশিবে না। তিনটি বালক পাঠশালায় যাইতেছে ইত্যাদি।

উপরের বাক্যগুলির মধ্যে—ভাল, দুষ্ট, তিনটি ; এইগুলি ছেলে, লোকের ও বালকের দোষ, গুণ, অবস্থা বুঝাইতেছে। অতএব ইহারা বিশেষণ পদ।

বিশেষণ পদ তিন প্রকার ; যথা ঃ—(১) বিশেষ্যের বিশেষণ (২) বিশেষণের বিশেষণ (৩) ক্রিয়ার বিশেষণ।

সর্বনাম পদ

যে পদ বিশেষ্য পদের পরিবর্তে বসে, তাহাকে সর্বনাম পদ বলে। যথা—১। হরি আগরপাড়ায় বাস করে। হরির পিতার নাম রামচন্দ্র।

উপরের বাক্যগুলিতে বারে বারে 'হরি' বলায় শুনিতে খারাপ শোনায়। হরি আগরপাড়ায় বাস করে। তাহার পিতার নাম রামচন্দ্র। এইভাবে বলিলে শুনিতে ভাল হয়। অতএব "তাহার"—হরির পরিবর্তে বসিয়াছে বলিয়া সর্বনাম পদ। নিম্নের শব্দগুলি সর্বনাম পদ ; যথা ঃ—আমি, তুমি, আমাকে, তোমাকে, সে, তাহারা, তাহাকে, তিনি, উনি, ইনি, উহারা, ইহাদের, কে ইত্যাদি।

অব্যয় পদ

বিভক্তি যোগ করিলেও যে পদের আকৃতির কোন পরিবর্তন হয় না, সর্বদা একই প্রকার থাকে, তাহাদিগকে **অব্যয়** পদ বলে। যথা—কিন্তু, যদি, ও, সহিত ইত্যাদি।

অব্যয় পদ সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা—

১। সংযোজক অব্যয়। যেমন—ও, এবং, আর, যদি ইত্যাদি।

২। বিয়োজক অব্যয়। যেমন—বা, অথবা, কিংবা, কিন্তু ইত্যাদি।

৩। প্রশ্নসূচক অব্যয়। যেমন - কি, নাকি, কেন ইত্যাদি।

৪। সম্বোধনসূচক অব্যয়। যেমন – ওহে, ওগো, হে ইত্যাদি।

৫। ভাবসূচক অব্যয়। যেমন - ছি, হায়, হয়, ঠিক ইত্যাদি।

ক্রিয়াপদ

যে পদে যাওয়া, খাওয়া, পড়া ইত্যাদি কোন কাজ করা বুঝায়, তাহাকে ক্রিয়াপদ বলে। যথা—হরি খেলিতেছে, রাম পড়িতেছে, পাখী ডাকিতেছে। ইত্যাদি।

ক্রিয়াপদ দুই প্রকার। যথা—১। সমাপিকা ক্রিয়া ও ২। অসমাপিকা ক্রিয়া।

১। সমাপিকা ক্রিয়া—যে ক্রিয়াপদে বাক্য শেষ হয়, তাহাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যথা—সে খেলিতেছে। আমি পড়ি। বালকটি ঘুড়ি উড়ায়। ইত্যাদি।

অসমাপিকা ক্রিয়া—যে ক্রিয়াপদে বাক্য শেষ হয় না, তাহাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যথা—সে খাইয়া যাইবে। তুমি আসিলে বলিব ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। বিশেষ্য পদ কাহাকে বলে ?

২। অব্যয় কত প্রকার ও কি কি ?

৩। শব্দ কাহাকে বলে ?

৪। ক্রিয়াপদ কাহাকে বলে ?

বচন

বিশেষ্য এবং সর্বনামের সংখ্যাকে **বচন** বলে। বচন দুই প্রকার। যথা—একবচন ও বহুবচন।

একবচন যে বিশেষ্য বা সর্বনামে একটিমাত্র সংখ্যা বুঝায় তাহাকে বহুবচন বলে। যথা—বালকটি, সে, তুমি ইত্যাদি।

বহুবচন – যে বিশেষ্য বা সর্বনামে একের বেশী সংখ্যা বুঝায়, তাহাকে বহুবচন বলে। যথা —বালকেরা, তারা।

লিঙ্গ

যে পদের দ্বারা স্ত্রী বা পুরুষ বুঝায় তাহাকে **লিঙ্গ** বলে।

লিঙ্গ তিন প্রকার। যথা পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ।

১। পুংলিঙ্গ – যে পদের দ্বারা পুরুষ জাতিকে বুঝায়, তাহার নাম পুংলিঙ্গ। যথা—বালক, পুত্র, ছাত্র, বৃদ্ধ, পিতা ইত্যাদি।

২। স্ত্রীলিঙ্গ – যে পদের দ্বারা স্ত্রী জাতিকে বুঝায়, তাহার নাম স্ত্রীলিঙ্গ। যথা—মাতা, বালিকা, ছাত্রী, বাঘিনী ইত্যাদি।

৩। ক্লীবলিঙ্গ—যে পদে পুরুষ কিংবা স্ত্রী কিছুই বুঝায় না। তাহাকে ক্লীবলিঙ্গ বলে। যথা জল, ফল, আলো, মাটি ইত্যাদি।

কি প্রকারে পুংলিঙ্গকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিণত করা যায় তাহার কয়েকটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হইল ঃ

১। পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে অ-কার যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অজ	অজা	প্রিয়	প্রিয়া
সরল	সরলা	প্রথম	প্রথমা
বৃদ্ধ	বৃদ্ধা	জ্যেষ্ঠ	জ্যেষ্ঠা

২। পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে ঈ-কার যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
নদ	নদী	ছাত্র	ছাত্রী
নর	নারী	দেব	দেবী
সিংহ	সিংহী	কিশোর	কিশোরী

৩। পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে আনী যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
শিব	শিবাণী	ভব	ভবানী
ইন্দ্র	ইন্দ্রাণী	চাকর	চাকরানী

৪। পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে ই-কার যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
শিক্ষক	শিক্ষিকা	লেখক	লেখিকা
সেবক	সেবিকা	গায়ক	গায়িকা
পাঠক	পাঠিকা	বালক	বালিকা

৫। পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে নী বা ইনী যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
মালী	মালিনী	জেলে	জেলেনী
গুণী	গুণিনী	বাঘ	বাঘিনী

৬। পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে ইনি যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
মেধাবী	মেধাবিনী	যশস্বী	যশস্বিনী
মায়াবী	মায়াবিনী	তপস্বী	তপস্বিনী

৭। পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে বতী ও মতী যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বুদ্ধিমান	বুদ্ধিমতী	ভগবান	ভগবতী
রূপবান	রূপবতী	শ্রীমান	শ্রীমতি

৮। পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
কবি	মহিলা কবি	গোঁসাই	মা গোঁসাই
পুরুষ মানুষ	মেয়ে মানুষ	শিল্পী	মহিলা শিল্পী

৯। পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
মুনি	মুনি পত্নী	গুরু	গুরু পত্নী

১০। পৃথক শব্দ যোগ করে পুংলিঙ্গকে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
সাহেব	মেম, বিবি	নবাব	বেগম
স্বামী	স্ত্রী	পুত্র	কন্যা
বাবা	মা	কাকা	কাকী
কর্তা	গিন্নী	বর	কনে
রাজা	রাণী	দেবর	জা

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
সুর	সুরী (সূর্যের মানষী স্ত্রী, কুন্তী)	শূদ্র	শূদ্রা (শূদ্র জাতীয় নারী)
	সূর্যা (সূর্যের স্ত্রী দেবী)		শূদ্রাণী (শূদ্রের পত্নী)
ক্ষত্রিয়	ক্ষত্রিয়া (ক্ষত্রিয়া নারী)	আচার্য	আচার্যা (শিক্ষয়িত্রী)
	ক্ষত্রিয়ানী (ক্ষত্রিয়ের পত্নী)		আচার্যানী (আচার্য পত্নী)

এমন কতকগুলো শব্দ আছে যাদের স্ত্রীলিঙ্গ হয় না। যেমন—পর্বত, বৃক্ষ, হস্ত, দন্ত, সাগর, ঢাকী, ছুলি, বিপত্নীক ইত্যাদি।

এমন কতকগুলো শব্দ আছে যাদের পুংলিঙ্গ হয় না। যেমন—লতা, বিদ্যা, বুদ্ধি ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। লিঙ্গ কাহাকে বলে ? উহা কয় প্রকার ও কি কি ?

২। নীচের শব্দগুলোর লিঙ্গ পরিবর্তন কর ঃ

প্রিয়, প্রথম, সরল, কিশোর, সিংহ, চাকর, শিব, লেখক, সেবক, নায়ক, বাঘ, মেধাবী, বুদ্ধিমতী, মহিলা কবি, মেষ, কন্যা, গিন্নী, কনে, জা, আচার্য ও সূর্য্য।

শব্দ সম্বন্ধে বিভিন্ন জ্ঞান

একটি শব্দের অক্ষরগুলি স্থান পরিবর্তন করিয়া অন্য শব্দ গঠন ঃ

শব্দ	অন্য শব্দ	শব্দ	অন্য শব্দ
রাধা	ধারা	মাতা	তামা
হাসা	সাহা	রস	সর
লিখি	খিলি	কাটা	টাকা
তাহা	হাতা	রাশি	শিরা
লতা	তাল	থামা	মাথা

কতকগুলি শব্দ আছে যার অক্ষরগুলি স্থান পরিবর্তন করিলে একই শব্দ থাকে। যেমন ঃ –

বাবা	শিশি	হাহা
মামা	ছিছি	নানা
দাদা	দিদি	খাখা

চলিত শব্দ ও সাধু শব্দ

চলিত	সাধু	চলিত	সাধু
বিদ্যে	বিদ্যা	নৌকো	নৌকা
মিথ্যে	মিথ্যা	ঘেন্না	ঘৃণা
ইচ্ছে	ইচ্ছা	সুতো	সুতা
ভিজে	ভিজা	বদ্যি	বৈদ্য
ভিক্ষে	ভিক্ষা	নতুন	নূতন
দিস্তে	দিস্তা	বৈরাগী	বৈরাগী
তেষ্টা	তৃষ্ণা	পুজো	পূজা

চলিত	সাধু	চলিত	সাধু
পুণ্যি	পুণ্য	উপোস	উপবাস
সাধ্যি	সাধ্য	লিখে	লিখিয়া
চলতে	চলিতে	বলতে	বলিতে
খেতে	খাইতে	খেলতে	খেলিতে

প্রতিশব্দ

কোন শব্দের একই অর্থবোধক বিভিন্ন শব্দকে প্রতিশব্দ বলে।

যথা—

আকাশ—গগন, ব্যোম, অন্তরীক্ষ, অম্বর, নভঃ শূন্য অনন্ত।

জগৎ—পৃথিবী, ভূষণ, ধরিত্রী, বিশ্ব, বসুন্ধরা, অবনী।

কিনারা - তীর, কূল, পার্শ্ব, প্রান্ত, পাড়, প্রতিকার, উপায়।

পক্ষী—পাখী, খগ, বিহঙ্গ, শকুন্ত খেচর, বিহগ, বিহঙ্গম।

বন—অরণ্য, কানন, জঙ্গল, বিপিন।

নদী—তটিনী, প্রবাহিনী, তরঙ্গিনী, শ্রোতস্বিনী, দরিয়া, সরি।

পুরুষ

পুরুষ কাকে বলে?

সাধারণতঃ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদকেই পুরুষ বলে।

পুরুষ কয় প্রকার ও কি কি?

পুরুষ তিন প্রকার। (১) উত্তম পুরুষ, (২) মধ্যম পুরুষ ও (৩) প্রথম পুরুষ।

উত্তম পুরুষ কাকে বলে?

নিজের সম্বন্ধে কিছু বলা হলে তাকে বলে উত্তম পুরুষ। যেমন—আমি, আমরা, আমাকে আমাদের, মোর ইত্যাদি।

মধ্যম পুরুষ কাকে বলে ?

কাছের বা দূরের সম্পর্কে কিছু বলা হলে তাকে মধ্যম পুরুষ বলে। যেমন—তুমি, তোমরা, তোমাদের, তুই, তোরা, আপনি, আপনাদের তোদের ইত্যাদি।

প্রথম পুরুষ কাকে বলে ?

উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ ছাড়া সব বিশেষ্য ও সর্বনাম পদকে বলে প্রথম পুরুষ। যেমন—সে, তিনি, তারা, রাম, হরি, বই, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি।

উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	প্রথম পুরুষ
আমি পড়ি	তুমি পড়	সে পড়ে
আমি পড়ছি	তুমি পড়ছ	সে পড়ছে
আমি পড়ছিলাম	তুমি পড়ছিলে	সে পড়ছিল

অনুশীলনী

১। পুরুষ কাকে বলে ? উহা কয় প্রকার ও কি কি ?

২। নীচের বাক্যগুলো হতে পুরুষ বার কর ঃ

(ক) রাম ভাল ছেলে। (খ) সে প্রত্যহ বিদ্যালয়ে যায়। (গ) সে মন দিয়ে লেখাপড়া করে। (ঘ) তার বাবা তাকে ভালবাসেন।

৩। নীচের শূন্যস্থানগুলোতে এক একটি পুরুষ বসাও ঃ

(ক) —কি সেখানে যাবে ? (খ) জলে থাকে। (গ)—কোন্ শ্রেণীতে পড় ? (ঘ) —নাম কি ? (ঙ) —আমাদের দুধ দেয়। (চ) আমরা আজ—বাড়ি যাব না। (ছ) তোমরা—বাড়ি আসিবে। (জ) —আজ পড়া হয় নাই।

বিভক্তি

বিভক্তি কাকে বলে ?

যে সব চিহ্ন বিশেষ্য বা সর্বনাম পদে যুক্ত হয়ে তাদের বচন নির্দেশ করে তাকে বলে **বিভক্তি**।

বিভক্তি কয় প্রকার ও কি কি ?

বিভক্তি দু'প্রকার। (১) শব্দ বিভক্তি, (২) ধাতু বিভক্তি।

শব্দ বিভক্তি কাকে বলে ?

শব্দের শেষে বিভক্তি যোগ হলে তাকে বলে শব্দ বিভক্তি।

ধাতু বিভক্তি কাকে বলে ?

ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যোগ হলে তাকে বলে ধাতু বিভক্তি।

শব্দ বিভক্তি কয় প্রকার ও কি কি ?

শব্দ বিভক্তি সাত প্রকার। প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী

শব্দ বিভক্তি—রাম + কে = রামকে।
বালক + এরা = বালকেরা।
ধাতু বিভক্তি—যা + ই = যাই।
খা + ই = খাই।

শব্দ বিভক্তির চিহ্ন

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা—	অ, এ, তে	রা, এরা, গণ।
দ্বিতীয়া—	কে, রে, য়	দিগকে, দিগের, দিগে।

তৃতীয়া —	দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক	দিগের দ্বারা, গণের দ্বারা, দের দ্বারা।
চতুর্থী —	কে, রে, য়	দিগকে, দিগের, দিগে।
পঞ্চমী —	হতে, থেকে, চেয়ে	দিগের হতে, দের থেকে, দের চেয়ে।
ষষ্ঠ—	র, এর	দের, দিগের।
সপ্তমী —	তে, এ, এতে	দিগে, দিগেতে।

অনুশীলনী

১। বিভক্তি কাকে বলে? উহা কয় প্রকার ও কি কি?

২। শব্দ বিভক্তি কয় প্রকার ও কি কি?

———

কারক

কারক কাকে বলে?

বাক্যে ক্রিয়া পদের সঙ্গে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের যে সম্বন্ধ তাকে বলে **কারক**।

কারক কয় প্রকার ও কি কি?

কারক ছয় প্রকার। যথাঃ—(১) কর্তা বা কর্তৃকারক, (২) কর্ম কারক, (৩) করণ কারক, (৪) সম্প্রদান কারক, (৫) অপাদান কারক, (৬) অধিকরণ কারক।

কর্তা বা কর্তৃকারক কাকে বলে ?

যে পদ ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে বলে, কর্তা বা কর্তৃকারক। যেমন, ঝুমা বইটি পড়েছে। এখানে কে পড়েছে জিজ্ঞাসা করলে উত্তর পাওয়া যায় ঝুমা। সুতরাং ঝুমা কর্তা বা কর্তৃকারক।

কর্তা বা কর্তৃকারকে কি বিভক্তি হয় ?

কর্তা বা কর্তৃকারকে **প্রথমা বিভক্তি** হয়।

কর্মকারক

কর্মকারক কাকে বলে ?

কর্তা যা করে তাকে বলে কর্মকারক। যেমন—তাপসী বই পড়ছে। কি পড়ছে ? এই প্রশ্ন করলে উত্তর মেলে—বই। সুতরাং বই কর্মকারক।

কর্মকারকে কি বিভক্তি হয় ?

কর্মকারকে **দ্বিতীয়া বিভক্তি** হয়।

করণ কারক

করণ কারক কাকে বলে ?

কর্তা যা দিয়ে ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে বলে করণ কারক। যেমন—রমা কলম দিয়ে লেখে। এখানে রমা কি দিয়ে লেখে প্রশ্ন করলে উত্তর মেলে 'কলম' দিয়ে। সুতরাং 'কলম' করণ কারক।

করণ কারকে কি বিভক্তি হয় ?

করণ কারকে **তৃতীয়া বিভক্তি** হয়।

সম্প্রদান কারক

সম্প্রদান কারক কাকে বলে ?

যাকে কিছু দান করা হয় তাকে সম্প্রদান কারক বলে। যেমন—

ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও। কাকে ভিক্ষা দাও জিজ্ঞাসা করলে উত্তর মেলে ভিক্ষুককে। সুতরাং ভিক্ষুককে সম্প্রদান কারক।

সম্প্রদান কারকে কি বিভক্তি হয় ?

সম্প্রদান কারকে **চতুর্থী বিভক্তি** হয়।

অপাদান কারক

অপাদান কারক কাকে বলে ?

যা থেকে কোন পতন বা উৎপত্তি বুঝায় তাকে বলে অপাদান কারক। যেমন—মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। কি থেকে বৃষ্টি হয়, প্রশ্ন করলে উত্তর মেলে 'মেঘ'। সুতরাং 'মেঘ' অপাদান কারক।

অপাদান কারকে কি বিভক্তি হয় ?

অপাদান কারকে **পঞ্চমী বিভক্তি** হয়।

অধিকরণ কারক

অধিকরণ কারক কাকে বলে ?

ক্রিয়া ঘটার স্হান বা সময়কে বলে অধিকরণ কারক। যেমন—পুকুরে মাছ থাকে। কোথায় মাছ থাকে প্রশ্ন করলে উত্তর মেলে পুকুরে। সুতরাং পুকুরে অধিকরণ কারক।

অধিকরণ কারকে কি বিভক্তি হয় ?

অধিকরণ কারকে **সপ্তমী বিভক্তি** হয়।

অধিকরণ কারক কয় প্রকার ও কি কি ?

অধিকরণ কারক তিন প্রকার। যথা—(১) আধারাধিকরণ, (২) কালাধিকরণ ও (৩) ভাবাধিকরণ।

অনুশীলনী

১। কারক কাকে বলে? উহা কয় প্রকার ও কি কি?

২। নীচের বাক্যগুলো থেকে কারক বার কর এবং কোন্ কারক ও কি বিভক্তি বল?

(ক) দুধ থেকে ছানা হয়। (খ) রাম, শ্যামকে ছড়ি দিয়ে মারল। (গ) অন্নহীনে অন্ন দাও। (ঘ) তিনি শ্রীরামপুরে থাকেন। (ঙ) মীনু বই পড়ে।

সম্বন্ধ পদ

সম্বন্ধ পদ কাকে বলে?

বাক্যের মধ্যে বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের যে সম্বন্ধ থাকে তাকে বলে সম্বন্ধ পদ। যেমন—অনিতার বোনের বিয়ে। এখানে অনিতার সঙ্গে বোনের সম্বন্ধ আছে। সুতরাং অনিতা **সম্বন্ধ পদ**।

সম্বন্ধ পদে কি বিভক্তি হয়?

সম্বন্ধ পদে **ষষ্ঠী বিভক্তি** হয়।

সম্বোধন পদ

সম্বোধন পদ কাকে বলে?

যে পদের দ্বারা সম্বোধন করা হয় তাকে, **সম্বোধন পদ** বলে। যেমন—হে ভগবান, আমায় ক্ষমা কর। এখানে ভগবানকে সম্বোধন করা হয়েছে। সুতরাং ভগবান পদটি সম্বোধন পদ।

সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ কারক নহে কেন ?

ক্রিয়ার সহিত কোন সম্পর্ক থাকে না বলে সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ কারক নহে।

অনুশীলনী

১। সম্বন্ধ পদ কাকে বলে ?

২। সম্বোধন পদ কাকে বলে ?

৩। সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ কারক নহে কেন ?

৪। নীচের বাক্যগুলো থেকে সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ বার কর ঃ

(ক) অনিতার পূজোর কাপড় এসেছে। (খ) কাশীর পেয়ারা খেতে খুব ভাল। (গ) ওহে শ্যাম, মিনতি জানাই। (ঘ) ওরে সন্ধ্যা, একবার এদিকে আয়।

ক্রিয়ার কাল

ক্রিয়ার কাল কাকে বলে ?

কোন কাজ সম্পন্ন হওয়ায় সময়কে বলে ক্রিয়ার কাল।

কাল কয় প্রকার ও কি কি ?

কাল তিন প্রকার। (১) বর্তমান কাল, (২) অতীত কাল, (৩) ভবিষ্যৎ কাল।

বর্তমান কাল কাকে বলে ?

যে কাজ এখন হচ্ছে এরূপ বুঝায় তাকে বলে **বর্তমান কাল** যেমন—তুমি পড়ছ।

অতীত কাল কাকে বলে ?

যে কাজ আগে হয়ে গেছে এরূপ বুঝায় তাকে **অতীত কাল** বলে। যেমন—কণা এখানে এসেছিল।

ভবিষ্যৎ কাল কাকে বলে ?

যে কাজ পরে হবে এরূপ বুঝায় তাকে বলে **ভবিষ্যৎ কাল**। যেমন—তুমি বইটি পড়বে।

অনুশীলনী

১। ক্রিয়ার কাল কাকে বলে ?

২। ক্রিয়ার কাল কত প্রকার ও কি কি ?

সন্ধি

বর্ণের সাথে বর্ণের মিলনকে **সন্ধি** বলে। সন্ধি দুই প্রকার—যথা ঃ স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি।

স্বরসন্ধি

স্বরসন্ধি কাকে বলে ?

স্বরবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের যে মিলন হয় তাকে বলে **স্বরসন্ধি**।

১। সূত্র—অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকলে উভয়ে মিলে আ-কার হয়। ঐ আকার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—

দেব + আদেশ = দেবাদেশ	(অ + আ = আ)
শশ + অঙ্ক = শশাঙ্ক	(অ + অ = আ)
বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়	(আ + আ = আ)
আশা + অতীত = আশাতীত	(আ + অ = আ)

২। সূত্র—ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঈ-কার হয়। ঈ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—

রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র (ই + ই = ঈ)
মণি + ইন্দ্র = মণীন্দ্র (ই + ই = ঈ)
শচী + ইন্দ্র = শচীন্দ্র (ঈ + ই = ই)
পরি + ইক্ষা = পরীক্ষা (ই + ই = ঈ)

৩। সূত্র—উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঊ-কার হয়। ঊ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—

লঘু + ঊর্মি = লঘূর্মি (উ + উ = ঊ)
বধূ + উক্তি = বধূক্তি (ঊ + উ = ঊ)
ভূ + ঊর্দ্ধ = ভূর্দ্ধ (ঊ + ঊ = ঊ)

৪। সূত্র—অ-কার কিংবা আ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে এ-কার হয়। এ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—

নর + ইন্দ্র = নরেন্দ্র (অ + ই = এ)
যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট (আ + ই = এ)
উমা + ঈশ = উমেশ (আ + ঈ = এ)
গণ = ঈশ = গণেশ (অ + ঈ = এ)

৫। সূত্র—অকার কিংবা আকারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ও-কার হয়। ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—

সহ + উদর = সহোদর (অ + উ = ও)
গঙ্গা + ঊর্মি = গঙ্গোর্মি (আ + উ = ও)
মহা + উদয় = মহোদয় (আ + উ = ও)

৬। সূত্র—অকার কিংবা আকারের পর একার কিংবা ঐকার থাকলে উভয়ে মিলে ঐ-কার হয়। ঐ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—

এক + এক = একৈক (অ + এ = ঐ)

জন + এক = জনৈক (অ + এ = ঐ)

সদা + এব = সদৈব (আ + এ = ঐ)

৭। সূত্র—অকার কিংবা আকারের পর ঋ-কার থাকলে উভয়ে মিলে অর্ হয়। অর-এর অ পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়, আর র্ রেফ হয়ে পরবর্ণের মাথায় বসে। যথা—

দেব + ঋষি = দেবর্ষি (অ + ঋ = অর্)

মহা + ঋষি = মহর্ষি (আ + ঋ = অর্)

৮। সূত্র—অকার কিংবা আকারের পর ও-কার কিংবা ঔ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঔ-কার হয়। ঔ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—

বন + ঔষধ = বনৌষধ (অ + ঔ = ঔ)

জল + ওকা = জলৌকা (অ + ও = ঔ)

৯। সূত্র—ই, ঈ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকলে ই, ঈ স্থানে য্ হয়। য্-যফলা হয়ে পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

১০। সূত্র—উ, ঊ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকলে উ, ঊ স্থানে ব্ হয়। ব্-বফলা হয়ে পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—

সু + আগত = স্বাগত (উ + আ = ব্)

বধূ + আগমন = বধ্বাগমন (ঊ + আ = ব্)

১১। সূত্র—ঋ-কার ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকলে ঋ-কার স্থানে র হয়। র্ পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—

পিতৃ + আলয় = পিত্রালয় (ঋ + আ = র্)

মাতৃ + আদেশ = মাত্রাদেশ (ঋ + আ = র)

১২। সূত্র—স্বরবর্ণ পরে থাকলে এ স্থানে অয়্, ঐ স্থানে আয়্, ও স্থানে অব্ এবং ঔ স্থানে আব্ হয়।

শো + অন = শয়ন (এ + অ = অয়্)

নৈ + অক = নায়ক (ঐ + অ = আয়্)

পো + অন = পবন (ও + অ = অব্)

পৌ + অক = পাবক (ঔ + অ = আব্)

ব্যঞ্জনসন্ধি কাকে বলে?

স্বরবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের অথবা ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনকে **ব্যঞ্জন সন্ধি** বলে।

১। সূত্র—ত কিংবা দ এর পর চ কিংবা ছ থাকলে ত ও দ স্থানে চ্ হয়। যথা—

উৎ + চারণ = উচ্চারণ (ত + চ = চ)

সৎ + চরিত্র = সচ্চরিত্র (অ + চ = চ)

উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ (ত + ছ = চ)

তদ + ছবি = তচ্ছবি (দ + ছ = চ)

২। ত কিংবা দ এর পর জ কিংবা ঝ থাকিলে ত ও দ স্থানে জ্ হয়। যথা—

সৎ + জন = সজ্জন (ত + জ = জ)

জগৎ + জ্যোতি = জগজ্জ্যোতি (ত + জ = জ)

৩। সূত্র—চ কিংবা জ-এর পর ন থাকিলে ন স্থানে ঞ হয়। যথা-

যাচ্ + না = যাচঞা (চ + ন = ঞ)

রাজ + নী = রাজ্ঞী (জ + ন = ঞ)

বজ্ + ন = যজ্ঞ (জ + ন = ঞ)

৪। সূত্র—ত্ কিংবা দ্-এর পর ট কিংবা ঠ থাকিলে ত্ ও দ্ স্থানে ট হয়। যথা—

বৃহৎ + ঠক্কুর = বৃহট্ঠক্কুর (ত + ঠ = ট্)

তদ্ + টীকা = তট্টিকা (দ্ + ট = ট্)

৫। সূত্র—ত্ কিংবা দ্ এর পর ড কিংবা ঢ থাকলে ত্ ও্ দ্ স্থানে ড হয়। যথা—

উৎ + ডীন = উড্ডীন (ত্ + ড = ড)

বৃহৎ + ঢক্কা = বৃহড্ঢক্কা (ত্ + ঢ = ড)

তদ্ + ডঙ্কা = তড্ডঙ্কা (দ্ + ড = ড)

৬। সূত্র—ত্ কিংবা দ্-এর পর হ থাকলে উভয়ে মিলে দ্ধ হয়। যথা—

উৎ + হত = উদ্ধত (ত + হ = দ্ধ)

উৎ + হার = উদ্ধার (ত + হ = দ্ধ)

তদ্ + হিত = তদ্ধিত (দ + হ + দ্ধ)

৭। সূত্র—ত্ কিংবা দ্-এর পর ল থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে ল্ হয়। যথা—

উৎ + লাস = উল্লাস (ত্ + ল = ল)

উৎ + লেখ = উল্লেখ (ত + ল = ল)

উৎ + লিখিত = উল্লিখিত (ত + ল = ল)

তৎ + লিখিত = তল্লিখিত (ত + ল = ল)

৮। সূত্র—ত্ কিংবা দ্-এর পর শ থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে চ এবং শ স্থানে ছ হয়। যথা—

উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস (ত্ + শ্ = চ্ছ)

উৎ + শৃঙখল = উচ্ছৃঙখল (ত্ + শ = চ্ছ)
চলৎ + শক্তি = চলচ্ছক্তি (ত্ + শ = চ্ছ)
তদ্ + শ্রবণ = তচ্ছ্রবণ (ত + শ = চ্ছ)

৯। সূত্র—ষ-এর পর ত স্থানে ট এবং ত থাকলে ঠ হয়। যথা—

উৎকৃষ্ + ত = উৎকৃষ্ট (ষ্ + ত্ = ট)
আকৃষ্ + ত = আকৃষ্ট (ষ্ + ত্ = ট)
ষষ্ + থ = ষষ্ঠ (ষ্ + ত্ = ঠ)

১০। সূত্র—ছ পরে থাকলে স্বরবর্ণের পর চ হয়। যথা—

আ + ছাদন = আচ্ছাদন (আ + ছ = চ)
রবি + ছবি = রবিচ্ছবি (ই + ছ = চ)

১১। সূত্র—উৎ উপসর্গের পরস্থিত স্থা ধাতুর স-কারের লোপ হয়। যথা—

উৎ + স্থান = উত্থান (ত্ + স্থ = ত্থ)
উৎ + স্থাপন = উত্থাপন (ত্ + স্থ = ত্থ)
উৎ + স্থিত = উত্থিত (ত্ + স্থ = ত্থ)

১২। সূত্র - ত পরে থাকলে ম স্থানে ন লয়। যথা—

সম + তাপ = সন্তাপ (ম + ত = ন)

১৩। সূত্র—পদের অন্তঃস্থিত ম্-এর পর যদি য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ থাকে তাহলে ম্ স্থানে ং হয়। যথা—

সম্ + বাদ = সংবাদ (ম + ব = ং)
সম + যোগ = সংযোগ (ম + য = ং)
সম্ + সার = সংসার (ম + স = ং)

বিপরীতার্থক শব্দ

মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
অল্প	অধিক	চঞ্চল	শান্ত
অগ্র	পশ্চাৎ	চালাক	বোকা
অমৃত	গরল	চোর	সাধু
অন্ধকার	আলোক	জয়	পরাজয়
আদি	অন্ত	জন্ম	মৃত্যু
আয়	ব্যয়	জীবন	মরণ
আহার	অনাহার	জ্ঞানী	মূর্খ
আকাশ	পাতাল	তরল	কঠিন
আশা	নিরাশা	তস্কর	সাধু
আসা	যাওয়া	তরুণ	বৃদ্ধ
আদান	প্রদান	দিন	রাত্রি
আসল	নকল	দাতা	কৃপণ
আশ্রয়	নিরাশ্রয়	দোষ	গুণ
আনন্দ	নিরানন্দ	দুর্গন্ধ	সুগন্ধ
উদয়	অস্ত	ধর্ম	অধর্ম
উচ্চ	নীচ	ধার্মিক	পাপিষ্ঠ
উত্তম	অধম	নব	পুরাতন
উষ্ণ	শীত	নীচে	উপরে
উপকার	অপকার	নীরব	সরব
ইহলোক	পরলোক	পাপ	পুণ্য
উচিত	অনুচিত	পাকা	কাঁচা
কৃশ	স্থূল	প্রভু	ভৃত্য

মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
কনিষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ	পণ্ডিত	মূর্খ
কঠিন	কোমল	পুরাতন	নূতন
খালি	ভর্তি	বোকা	চালাক
গুরু	শিষ্য	ভয়	সাহস
গরিব	ধনী	ভাল	মন্দ
গরম	ঠাণ্ডা	ভাব	আড়ি
গ্রহণ	দান	রাজা	প্রজা
লম্বা	বেঁটে	শক্ত	নরম
শত্রু	মিত্র	শোক	আনন্দ
সত্য	মিথ্যা	শীত	গ্রীষ্ম
স্বর্গ	নরক	সুনাম	দুর্নাম

অনুশীলনী

১। নীচের শব্দগুলোর বিপরীতার্থক শব্দ লেখ ঃ

সাদা, শুকনো, সফল, আসল, শুরু অনেক, মন্হর, সৃষ্টি, জলচর, সমতল, জোয়ার।

সমার্থক শব্দ

সূর্য—আদিত্য, ভানু, ভাস্কর, তপণ, অরুণ, সবিতা, দিবাকর, প্রভাকর।

পৃথিবী—ধরণী, বসুমতী, বসুন্ধরা, অবনী, ক্ষিতি, মেদিনী, পৃথ্বী।

জল—বারি, নীর, সলিল, পয়, অপ।

সম্ + শয় = সংশয় (ম + শ = ং)

১৪। স্পর্শবর্ণ পরে থাকলে পদের অন্তঃস্থিত ম স্থানে ং হয়। যথা—

সম্ + সার = সংসার (ম + স = ং)
সম + বাদ = সংবাদ (ম + ব = ং)

১৫। সূত্র—যদি স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় কিংবা চতুর্থ বর্ণ অথবা য, র, ল, ব, হ পরে থাকে, তাহলে অন্তস্থিত ক্ স্থানে গ, চ স্থানে জ, ত স্থানে দ, ট স্থানে ত এবং প স্থানে ব হয়। যথা—

বাগ + ঈশ = বাগীশ (ক্ + ঈ = গ)
জগৎ + ঈশ্বর = জগদীশ্বর (ৎ + ঈ = দ)
বাক্ + আড়ম্বর = বাগাড়ম্বর (ক্ + আ = গ)

১৬। সূত্র—ন কিংবা ম পরে থাকলে পদের অন্তেস্থিত বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। যথা—

উৎ + মত্ত = উন্মত্ত (ত্ + ম = ন)
মৃৎ + ময় = মৃন্ময় (ত্ + ম = ন)
জগৎ + নাথ = জগন্নাথ (ত্ + ন = ন)
জগৎ + মাতা = জগন্মাতা (ত্ + ম = ম)

অনুশীলনী

১। সন্ধি কাকে বলে? উহা কয় প্রকার ও কি কি?

২। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :

হিমালয়, মণীন্দ্র, যথেষ্ট, তথৈব, মৃন্ময়, বাগীশ, সংসার।

৩। সন্ধি কর :

শশ + অঙ্ক, পিতৃ + আলয়, দেব + ঋষি, উৎ + চারণ, মহী + ইন্দ্র উৎ + হত, উৎ + ডীন, জগৎ + ময়।

অশুদ্ধি সংশোধন

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অস্রু	অশ্রু	দরিদ্রতা	দারিদ্রতা
অনুকুল	অনুকূল	নিরব	নীরব
অপরাহ্ণ	অপরাহ্ন	পূণ্য	পুণ্য
অত্যাধিক	অত্যধিক	পুরষ্কার	পুরস্কার
অনাটন	অনটন	ব্যায়	ব্যয়
অঞ্জলি	অঞ্জলী	ব্যাথা	ব্যথা
আরতী	আরতি	ব্যাগ্র	ব্যগ্র
আষাড়	আষাঢ়	বাল্মিকী	বাল্মীকি
আত্মিয়	আত্মীয়	ব্যাবহার	ব্যবহার
আমাবস্যা	অমাবস্যা	মুর্খ	মূর্খ
আবিস্কার	আবিষ্কার	মুহুর্ত	মুহূর্ত
আকাঙখা	আকাঙ্ক্ষা	রবিন্দ্র	রবীন্দ্র
উজবল	উজ্জ্বল	হটাৎ	হঠাৎ
ঊর্ধ	ঊর্ধ্ব	যাবদীয়	যাবতীয়
ঋণগ্রস্হ	ঋণগ্রস্ত	শারিরিক	শারীরিক
কস্ট	কষ্ট	স্বরসতী	সরস্বতী
কালীদাস	কালিদাস	লক্ষী	লক্ষ্মী
কল্যান	কল্যাণ	লক্ষণ	লক্ষ্মণ
কৌতুহল	কৌতূহল	মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট
গরিষ্ঠ	গরিষ্ঠ	সাস্হ্য	স্বাস্থ্য
তিরষ্কার	তিরস্কার	দুরাবস্হা	দুরবস্থা
দূর্গা	দুর্গা	দুরাদৃষ্ট	দুরদৃষ্ট

নদী—তটিনী, স্রোতস্বতী, তরঙ্গিণী, সরিৎ।

কন্যা—তনয়া, মেয়ে, দুহিতা, নন্দিনী।

পুত্র—ছেলে, তনয়, নন্দন।

অঙ্গ—দেহ, শরীর, বপু, কলেবর, তনু।

চক্ষু—নেত্র, নয়ন, লোচন, আঁখি।

গৃহ—ঘর, ভবন, আলয়, আবাস, নিকেতন।

বেলা—তীরভূমি, সময়।

পত্র—পাতা, চিঠি।

বাক্য সংকোচন

যার অন্ত নাই—অনন্ত

যে লেখাপড়া জানে না—মূর্খ।

যা ফুটছে—ফুটন্ত

যে দান করে—দাতা।

যে প্রিয় কথা বলে—প্রিয়বাদী।

যার গুণ আছে—গুণী

যার চরিত্র ভাল—চরিত্রবান।

যা সহজে ভাঙ্গিয়া যায়—ভঙ্গুর।

পঙ্কে যাহা জন্মে—পঙ্কজ।

যা দেখা যায়—দৃশ্য।

যা খাওয়া যায়—খাদ্য।

যে সহজে ভয় পায়—ভীরু।

যা বলা হইয়াছে—উক্ত।

যার মৃত্যু নাই—অমর।

যা জ্বলছে—জ্বলন্ত।

যার লজ্জা আছে—লাজুক।

যার ধন নাই—নির্ধন।

যার পুত্র নাই—অপুত্রক।

যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে—আস্তিক

যাহা সহজে পাওয়া যায়—সুলভ।

যিনি অগ্রে জন্মেছেন—অগ্রজ।

যার তুলনা নাই—অতুলনীয়।

যা দেখা যায় না—অদৃশ্য।

যা পান করা যায়—পানীয়।

যা বলা উচিত নয়—অকথ্য।

যে ঘুমিয়েছে—সুপ্ত।

যুদ্ধ করে যে—যোদ্ধা। যা জলে চরে—জলচর।
যা সহজে পাওয়া যায় না—দুর্লভ। যার দাম খুব বেশী—দুর্মূল্য।
যে সহ্য করতে পারে—সহিষ্ণু। যা সহ্য করা যায় না—অসহ্য।
ভিক্ষার অভাব—দুর্ভিক্ষ। যা কাঁপছে—কম্পমান।

গল্প রচনা

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গল্প শুনতে ভালবাসে। গল্প শুনে তারা সেগুলো আবার বলতে ও লিখতে পারে। কিন্তু নিজেরা বানিয়ে কোন গল্প বলতে বা লিখতে তারা পারে না।

কোন গল্প লিখতে গেলে প্রথমে গল্পটা ভালভাবে মনে করে নিতে হবে। গল্পটার মধ্য থেকে কতকগুলো প্রশ্ন তৈরি করে তার উত্তর ঠিক মত লিখলেই গল্প লেখা হয়।

গল্পের শেষে তার উপদেশ লিখতে হয়।

মিথ্যাবাদীর সাজা

(১) এক রাখাল মাঠে গরু চরাত।

(২) মজা করবার জন্য পালে বাঘ পড়েছে বলে চিৎকার করত।

(৩) চাষীরা সাহায্যের জন্য ছুটে আসত।

(৪) শেষে সত্যই একদিন পালে বাঘ পড়ল।

এক রাখাল এক পাল গরু নিয়ে প্রত্যহ মাঠে চরাতে যেত। মাঠের পাশেই ছিল এক বন। মাঠে চাষীরা প্রত্যহ কাজ করতে আসত।

একদিন রাখালের মনে এক বুদ্ধির উদয় হল। চাষীদের সঙ্গে তামাসা করবার জন্যে পালে বাঘ পড়েছে বলে চিৎকার করে উঠল।

রাখালের চিৎকার শুনে চাষীরা কাজ ফেলে সেখানে গিয়ে দেখল বাঘ আসেনি। রাখাল তাদের দেখে খিল খিল করে হাসছে। চাষীরা রাখালের আচরণে বিরক্ত হল।

একদিন সত্যি সত্যি রাখালের পালে বাঘ এসে পড়ল। 'বাঘ এসেছে, বাঘ এসেছে' বলে রাখাল খুব চিৎকার করল, কিন্তু তার কথায় কেউ বিশ্বাস করল না। বাঘ রাখালের গুরুগুলোকে খেয়ে ফেলল। শেষে রাখালকেও হত্যা করে চলে গেল

উপদেশ—মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না।

[নীচের সংকেতগুলোর সাহায্যে এক একটি গল্প রচনা কর।]

একতাই বল

(১) এক কৃষকের পাঁচটি ছেলে ছিল।
(২) ছেলেদের মধ্যে একটুও মিল ছিল না।
(৩) কৃষক পাঁচটি কঞ্চি এনে আঁটি বাঁধল।
(৪) আঁটিটি কেউ ভাঙতে পারল না।
(৫) তারপর আঁটি খুলে প্রত্যেককে একটি করে কঞ্চি দিল।

কাঠুরিয়া ও জলদেবতা

(১) কাঠুরে এক নদীর ধারে কাঠ কাটত।
(২) একদিন তার কুঠারখানা নদীর জলে পড়ে গেল।
(৩) কাঠুরে খুব কাঁদতে থাকল।
(৪) কাঠুরের দুঃখে জল-দেবতার দয়া হল।
(৫) লোহার কুঠারের সঙ্গে সে একখানি সোনার কুঠার পেল।

পত্র লিখন

আমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধব অনেকেই বিদেশে থাকেন। তাঁহাদের সহিত যোগাযোগ রাখিতে হইলে, নিজেদের বক্তব্য ভাষায় লিখিয়া জানাইতে হয়। লিখিয়া জানাইবার এই রীতিকেই পত্র বা চিঠি লেখা বলে। সাধু ও কথ্য উভয় ভাষাতেই চিঠি লেখা যায়।

পত্র বা চিঠি লিখিবার কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে। সেই নিয়মগুলি যতদূর সম্ভব পালন করা উচিত।

যে কোন চিঠির প্রথমে ডানদিকের কোণায় লেখকের নাম, ঠিকানা ও তারিখ লিখিতে হয়। অনেক চিঠির উপরে ঠিক মাঝখানে দেব-দেবীর নাম লেখেন। তাহার পর থাকে সম্ভাষণ, যাহাকে চিঠি লেখা হয়, তাহার সহিত লেখকের সম্বন্ধ অনুযায়ী এই সম্ভাষণ লেখা হয়।

আত্মীয়-গুরুজনকে চিঠি লিখিতে হইলে সম্ভাষণ হইবে—শ্রীচরণকমলেষু, শ্রীচরণেষু, পূজনীয়েষু, পূজনীয়া প্রভৃতি। অন্যান্য গুরুজনকে – মান্যবরেষু, মাননীয়া, মাননীয় প্রভৃতি লিখিতে হয়।

স্নেহের পাত্র বা বয়সে ছোট হইলে সম্ভাষণ হইবে—

স্নেহাস্পদেষু, কল্যাণীয়েষু, কল্যাণীয়াষু ইত্যাদি। সমান বয়সের অথবা বন্ধুদের চিঠিতে সম্ভাষণ হইবে ঃ—প্রিয়বন্ধু, প্রিয়বরেষু, বন্ধুবরেষু, প্রীতিভাজনেষু, প্রিয় সাথী ইত্যাদি।

তারপর পত্রের বিষয়বস্তু বা লেখকের বক্তব্য লিখিতে হয়। নিজের কথাগুলি অতি সহজে ও সংক্ষেপে লেখা উচিত। বেশ ভাবিয়া-

চিন্তিয়া কথাগুলি গুছাইয়া লিখিতে হয়। খেয়াল রাখিতে হইবে যাহাতে কোন কথা বাদ না যায়। উত্তর লিখিবার সময় যে পত্রের উত্তর, সেই পত্রখানি ভালভাবে পড়িয়া লইতে হয়। যাঁহাকে চিঠি লেখা হয় তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়া এবং তাঁহার কুশল প্রশ্ন করিয়া চিঠি শেষ করিতে হয়।

চিঠি লেখার শেষে নিজের নাম সহি করিতে হয়। নিজের নাম লিখিবার আগে যাহাকে চিঠি লেখা হয় তাঁহার সহিত সম্বন্ধ অনুসারে একটি বিশেষণ ব্যবহার করিতে হয়। যেমন—গুরুজনকে চিঠি লিখলে —প্রণত, সেবক, সেবিকা, স্নেহের, স্নেহধন্য শ্রীচরণাশ্রিত ইত্যাদি লিখিতে হয়। সম্মানীয় ব্যক্তিকে—অনুগত, নিবেদক, ভবদীয়, গুণমুগ্ধ ইত্যাদি। বয়সে ছোট হইলে বা আশীর্বাদের পাত্রকে—আশীর্বাদক, শুভাকাঙ্খী, চিরশুভার্থী, চিরশুভানুধ্যায়ী ইত্যাদি এবং বন্ধুকে 'তোমরই' লিখিতে হয়।

চিঠির ঠিকানা সব সমর পরিষ্কার ও স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হয়। ঠিকানা পড়িতে না পারিলে অথবা ভুল ঠিকানা লিখিলে চিঠি হয় দেরীতে পেঁাছিবে, নয় একেবারে পেঁাছিবে না।

নামের পর গ্রামের নাম, ডাকঘরের নাম, জেলার নাম, এবং অনেক সময় প্রদেশের নাম লিখিতে হয়। শহরের চিঠি হইলে বাড়ীর নম্বর, রাস্তার নাম এবং ডাকঘরের নাম বা নম্বর লিখিতে হয়। পর পৃষ্ঠায় কয়েকটি নমুনা দেওয়া হইল।

শ্রীশ্রীহরি সহায়। পোঃ—রায়গঞ্জ

২২শে অক্টোবর, ১৯৮১

শ্রীচরণকমলেষু—

মা, তোমার চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। ওখানে সকলে ভাল আছে জানিয়া সুখী হইলাম।

আমাদের পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। আমি অর্ধ বার্ষিক পরীক্ষায় সব বিষয়ে ভালভাবে পাশ করিয়াছি। বার্ষিক পরীক্ষায় আরও ভাল নম্বর পাইবার চেষ্টা করিব। সেজন্য মামার কাছে নিয়মিত পড়াশুনা করিতেছি।

এখানে দিদিমার শরীর বিশেষ ভাল না। কয়েকদিন যাবৎ সর্দি জ্বরে ভুগিতেছেন। দাদু, মামা ও মামীমা ভাল আছেন। আমি বেশ ভালই আছি।

বাবার শরীর কেমন আছে? বন্দনাকে বলিবে যেন রোজ পড়াশুনা করে। তুমি আমার প্রণাম লইবে। বাবাকে আমার প্রণাম দিও। বোনটিকে আমার স্নেহাশীষ জানাইও। সময়মত তোমার চিঠি না পাইলে আমার মন খারাপ হইবে।

ইতি—

প্রণত

তোমার স্নেহের

হারাণ

ঠিকানা ঃ—

পিতার নিকট পড়াশুনার খরচের টাকা চাহিয়া পত্র লিখ।

শ্রীশ্রীদুর্গাসহায়।

চম্পাহাটি

শ্রীচরণকমলেষু— ২২শে জানুয়ারী ১৯৮৭

বাবা, আমাদের স্কুল খুলিয়াছে। নূতন ক্লাশের পড়া শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। আমার সব বই এখনও কেনা হয় নাই। ইংরাজী বই পুরানো কিনিয়াছি। অন্যান্য বইগুলি কিনিতে মোট বার টাকা লাগিবে। তাহা ছাড়া কয়েকটি খাতাও কিনিতে হইবে। চিঠি পাইয়া আপনি আমাকে পনের টাকা পাঠাইয়া দিবেন। জামা-কাপড়ের জন্য এখন টাকা পাঠাইতে হইবে না।

এখানে দাদা, বৌদি ও খোকন ভাল আছেন ও আছে। আমার শরীরও বেশ ভাল। খোকন মাঝে মাঝে দাদু বলে। আপনি ও মা কেমন আছেন? আপনারা আমার প্রণাম লইবেন। রামুকে আমার আশীর্বাদ জানাইবেন। ইতি প্রণত

ঠিকানা ঃ— আপনার স্নেহের রতন

তুমি কেমন পরীক্ষা দিলে এ সম্বন্ধে একটি পত্র লিখ।

শ্রীশ্রীহরি সহায় কল্যাণপুর

শ্রীচরণকমলেষু— ১১ই ডিসেম্বর ১৯৮৮

কাকাবাবু, গতকাল আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। আমি আগামীকাল দিদির কাছে যাইব। সেখানে দুই-তিন দিন থাকিয়া বাড়ী ফিরিব।

পরীক্ষার কয়েকদিন আগে আমার জ্বর হইয়াছিল। পথ্য

করিয়াই আমি দুই দিন পরীক্ষা দিয়াছি। সেইজন্য ঐ দুইটি পরীক্ষা বিশেষ ভাল হয় নাই। মাঝে তিন দিন ছুটি থাকায় অন্যান্য পরীক্ষা ভালই হইয়াছে। পরীক্ষায় আমি ভাল নম্বর পাইব আশা রাখি। ভবিষ্যতে আরও ভাল ফল করিবার চেষ্টা করিব।

আমার শরীর বর্তমানে ভাল আছে। আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন। মা ও কাকীমাকে আমার প্রণাম জানাইবেন। ইতি—

প্রণত

আপনার স্নেহের কল্যাণ

ঠিকানা—

প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের নিকট ছুটির আবেদন।

নবগ্রাম

১২ই নভেম্বর ১৯৮৭

মাননীয় প্রধান শিক্ষক মহাশয় সমীপেষু

নবগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২৪ পরগণা।

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়, গত ৫ই নভেম্বর হইতে ১৫ই নভেম্বর পর্যন্ত আমি সর্দি জ্বরে ভুগিতেছিলাম। সেইজন্য ঐ দিনগুলিতে আমি বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে পারি নাই।

অতএব মহাশয় আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া উক্ত দিনগুলির ছুটি মঞ্জুর করিয়া বাধিত করিবেন। নিবেদন ইতি —

বিনীত

আপনার একান্ত অনুগত ছাত্র

শৈলেন্দ্র সরকার (চতুর্থ শ্রেণী)

স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভার বর্ণনা করিয়া বন্ধুকে চিঠি লিখ।

(চলতি ভাষায়)

বনগাঁ
২৮শে জানুয়ারী ১৯৮৭

ভাই অনিল,

এবার আমাদের স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় মাষ্টার মহাশয়ের অনুরোধে আমাকে আবৃত্তি করতে হয়েছিল। প্রথমে একটু ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু আমার আবৃত্তি ভালই হয়েছিল, সকলেই প্রশংসা করেছেন।

অতুলকে তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে। তার গান শুনে সকলেই খুশী হয়েছেন। অন্যান্য বছরের মত এবার কোন নাটক হয়নি। তবে অতিথিদের এবং সকল ছাত্রদের জন্য জলযোগের ব্যবস্থা ভাল হয়েছিল।

এবারের পুরস্কারের বইগুলি বেশীর ভাগ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, গৌর সবচেয়ে বেশী পুরস্কার পেয়েছে। আমি তিনটি বই পেয়েছি।

তুমি অনেক দিন চিঠি দাওনি। ওখানকার সব খবর দিয়ে চিঠির উত্তর দিও। প্রীতি নিও।— ইতি—

ঠিকানা ঃ
শ্রীঅনিল কুমার বসু
দিনহাটা রোড়, কোচবিহার।

তোমার
সুবোধ।

বন্ধুর কাছে লেখা পত্র

পোঃ—কাটোয়া
জেলা—বর্ধমান
১০।৫।৮৭

প্রিয় সমর

গতকাল তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুশী হয়েছি। তুমি পূজার ছুটিতে আসবে জেনে সুখী হলাম। তুমি কেমন আছ জানাবে। তোমার পড়াশুনা কেমন হচ্ছে জানাবে। তুমি আমার ভালবাসা নিও। গরুজনদের আমার প্রণাম দিও। আমি ভাল আছি। আমার পড়াশুনা ভালই হচ্ছে।

ইতি—
তোমার পার্থ

শ্রীসমর কুমার ভট্টাচার্য
১২. ঠাকুর দাস বাবু লেন
পোঃ – শ্রীরামপুর
জেলা—হুগলী

মাতাকে লেখা পুত্রের পত্র (মুসলিম)

পোঃ – গ্রাম—নবগ্রাম
জেলা—বর্ধমান
১৮।১।৮২

পাক জনাবেষু,

আম্মাজান,

খোদার ফজলে আমি নির্বিঘ্নে নবগ্রামে পেঁীচেছি। আপনি ও

বাপজান আমার বহুৎ বহুৎ সালাম জানবেন। আমি মন দিয়ে পড়াশুনা করছি। তাড়াতাড়ি উত্তর দিয়ে বান্দাকে খোস করবেন।

ইতি—বান্দা
মহম্মদ ইসমাইল

নূরজাহার বেগম প্রযত্নে, মহাম্মদ রোজা খাঁ ১২, কলুটোলা লেন কলিকাতা-১১	ডাকটিকিট

প্রবন্ধ রচনা

প্রাণিবিষয়ক প্রবন্ধ

গরু

গরু গৃহপালিত প্রাণী। ইহার চারটি পা, দুটি চোখ, দুটি কান, দুটি শিং, একটি মুখ ও লেজ আছে। লেজের শেষে এক গোছা লোম আছে। সারা শরীর লোমে ঢাকা। লাল, কাল, সাদা প্রভৃতি রঙের গরু দেখা যা। গরুর পায়ের ক্ষুরগুলি চেরা। গরু শান্ত ও নিরীহ প্রাণী। গরু ঘাস, খড়, খইল, ভুষি, ফেন প্রভৃতি খায়। প্রথমে তাড়াতাড়ি খায় ও পরে আস্তে আস্তে জাবর কাটে। গরু সব দেশেই দেখা যায়। গাভী আমাদের দুধ দেয়। দুধ থেকে ছানা, মাখন, দধি ঘি, মিষ্টান্ন প্রভৃতি হয়। বলদ গরুর গাড়ী ও লাঙ্গল টানে। গরুর চামড়ায় জুতা, ব্যাগ, সুটকেশ এবং হাড়ে বোতাম, ছুরিরবাঁট, চিরুণী ও সার হয়। গোবরে ঘুঁটে ও সার হয়।

কুকুর

কুকুর গৃহপালিত প্রাণী। কুকুরের চারিটি পা, দুইটি চোখ, দুইটি কান, একটি মুখ ও একটি লেজ আছে। কুকুর খুব প্রভুভক্ত। ইহারা অল্প খাদ্যে সন্তুষ্ট থাকে। পৃথিবীর সব দেশেই কুকুর দেখতে পাওয়া যায়। কুকুর নানা জাতির হয়। যেমন—বুলডগ, গ্রেহাউন্ড, অ্যালসেসিয়ান, স্প্যানিয়েল, সেন্টবার্ণার্ড, টেরিয়ার, ভারতীয় প্রভৃতি। কুকুর চোদ্দ-পনের বছর বেঁচে থাকে। মাছ ও মাংস কুকুরের প্রিয় খাদ্য। ইহারা ভাত, রুটি প্রভৃতি খায়। কুকুর দিন-রাত্রি বাড়ী পাহারা দেয়। বরফের দেশে কুকুর গাড়ী টানে। ইহারা সার্কাসে খেলা দেখায়। পুলিশ শিক্ষিত কুকুরের সাহায্যে চোর, ডাকাত ও খুনী আসামী ধরে থাকে। ক্ষ্যাপা বা পাগলা কুকুরের কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগ হয়।

বিড়াল

বিড়াল গৃহপালিত প্রাণী। বিড়ালের চারিটি পা, দুটি কান, দুটি চোখ, একটি মুখ ও একটি লেজ আছে। বিড়ালের মুখ গোল। বিড়ালের গোঁফ আছে। দেখতে অনেকটা বাঘের মত, তাই লোক বিড়ালকে বাঘের মাসী বলে। বিড়ালের পায়ের নীচে নরম মাংসপিণ্ড থাকায় সহজে পোষমানে। নরম বিছানায় থাকতে বিড়াল ভালবাসে। বিড়াল খুব ভাল শিকারী। বিড়াল প্রায় সব দেশে দেখতে পাওয়া যায়। বিড়াল সাদা, কাল, লাল প্রভৃতি রঙের হয়। বিড়ালের শরীর লোমে ঢাকা। মাছ, মাংস, দুধ, ভাত, বিড়ালের প্রিয় খাদ্য। ইঁদুর

মেরে বিড়াল গৃহস্থের উপকার করে। সুযোগ পেলে মাছ, মাংস, দুধ চুরি করে খায়। বিড়াল ডিপথিরিয়া রোগের জীবাণু বহন করে।

ঘোড়া

ঘোড়া গৃহপালিত প্রাণী। দেখতে খুব সুন্দর। ঘোড়ার চারটি পা, দুটি কান, দুটি চোখ, একটি মুখ ও একটি লেজ আছে। লেজের অগ্রভাগে এক গোছা লম্বা চুল আছে। ঘোড়ার ঘাড়ে বেশ বড় বড় লোম আছে। সমস্ত শরীর লোমে ঢাকা। ঘোড়ার চেহারা বেশ বলিষ্ঠ। লাল, কাল, সাদা ও বাদামী রঙের ঘোড়া দেখা হায়। ঘোড়া খুব শান্ত ও প্রভুভক্ত। ঘোড়া খুব সাহসী ও বুদ্ধিমান। ঘোড়া দাঁড়িয়ে ঘুমায়। ঘোড়া দ্রুত দৌড়াতে পারে। আরব ও অস্ট্রেলিয়ার ঘোড়া খুব প্রসিদ্ধ। ঘোড়া ঘাস, ছোলা, ভুষি প্রভৃতি খায়। ঘোড়া গাড়ী টানে, বোঝা বয় ও লাঙ্গল দেয়। ঘোড়া সার্কাসে খেলা দেখায়। ঘোড়ায় চড়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়। ঘোড়ার দৌড় খুব আমোদজনক খেলা। যুদ্ধে ও শিকারে ঘোড়া ব্যবহার করা হয়। ঘোড়ার চর্বি দিয়ে সাবান তৈরী হয়।

হাতী

হাতী চতুষ্পদ, স্তন্যপায়ী, তৃণভোজী প্রাণী। স্থলচর জন্তুদের মধ্যে হাতী সবচেয়ে বড়। হাতীর পা চারটি থামের মত মোটা। কান দুটি কুলার মত বড়। চোখ দুটি ছোট। হাতীর মুখে একটি লম্বা শুঁড় আছে। হাতীর মুখের দুপাশে দুটি সাদা বড় দাঁত থাকে। একে গজ দাঁত বলে। হাতী বন্য প্রাণী। এরা বনে দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। হাতীর বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর। ভারতবর্ষ, সিংহল, শ্যাম,ব্রহ্ম-দেশ ও আফ্রিকায় হাতী পাওয়া যায়। হাতী গাছের ডাল, পাতা, ফল,

কলাগাছ, বেল, নারিকেল, ধান, লবন প্রভৃতি খায়। হাতী ভারী জিনিস বয়ে নিয়ে যায়। হাতী সার্কাসে খেলা দেখায়। রাজারা হাতীর পিঠে চড়ে যুদ্ধ করতেন। শিকারীরা হাতীর পিঠে চড়ে শিকার করতে যায়। হাতীর দাঁত থেকে চিরুণী, চুড়ি, কৌটা, খেলনা প্রভৃতি তৈরী হয়।

সিংহ

সিংহ হিংস্র, মাংসাশী বন্য জন্তু। বল, বিক্রম, সাহস ও গাম্ভীর্যে সিংহ পশুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেজন্য একে পশুরাজ বলে। সিংহের ঘাড়ে কেশর থাকে, সিংহীর ঘাড়ে কেশর থাকে না। সিংহের চারটি পায়ের তলায় নখযুক্ত থাবা থাকে। সিংহের ডাক মেঘ গর্জনের ন্যায় ভীষণ। সিংহের মুখে গোঁফ থাকে। সিংহ ক্ষুধায় কাতর না হলে প্রাণী হত্যা করে না। সিংহ মৃত প্রাণী আহার করে না। সিংহ উপকারীর উপকার ভোলে না। এশিয়া, আফ্রিকা ও ভারতের গুজরাটের জঙ্গলে সিংহ দেখতে পাওরা যায়। সিংহ, গরু, মোষ ও অন্যান্য বন্য জন্তু শিকার করে খায়। সিংহকে পোষ মানিয়ে সার্কাসে খেলা দেখানো হয়।

প্রিয় (কোকিল)

কোকিল আমাদের বিশেষ প্রিয়। পাখীদের মধ্যে কোকিলের স্বর সবচেয়ে মিষ্ট। বসন্তকালে কোকিলের কুহু কুহু ডাক শোনা যায়। কোকিল দেখতে কাকের মত তবে আকারে ছোট। কোকিলের চোখ দুটি লাল। কোকিল খুব অলস পাখী। কোকিল বাসা তৈরি করতে পারে না। এরা কাকের বাসায় ডিম পাড়ে। কাক এদের শত্রু।

কোকিল গাছের ফল খায়। গাছের গর্তে, ঝোপে, জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে। অনেকে শখ করে কোকিল পুষে থাকে। কোকিল সব দেশে দেখা যায়।

নারিকেল গাছ

নারিকেল গাছ তাল জাতীয় উদ্ভীদ। ইহার গুঁড়ি গোল, মোটা এবং সরল। ইহার কোন শাখা প্রশাখা থাকে না। গাছের অগ্রভাগে লম্বা লম্বা পাতা বের হয়। নারিকেলের ফুল থেকে যে ফল হয়, তাকে ডাব বলে। ডাবের জল শরীরের পক্ষে খুব উপকারী। ডাব পাকলে তাকে ঝুনো নারিকেল বলা হয়। এই গাছ বৎসরে দুবার ফল দান করে। নোনা মাটিতে নারিকেল গাছ বেশী জন্মায়। ঝুনো নারিকেল থেকে সন্দেশ তৈরী হয়। নারিকেলের পাতার শিরায় ঝাঁটা তৈরী হয়। নারিকেলের খোলে হুকা হয়। ইহার শাঁস হতে তেল তৈরী হয়। নারিকেলের ছোবড়া হতে দাড়ি, পা-পোষ, গদী প্রভৃতি তৈরী হয়। নারিকেলের গুঁড়িতে ঘরের খুঁটি হয়। নারিকেল গাছ সব দেশে দেখা যায়।

ধান

ধান তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ। একবার মাত্র ফসল দিয়ে মরে যায় বলে একে ওষধি গাছ বলে। ধান গাছ তিন চার হাত লম্বা হয়। ধান প্রধানত তিন প্রকার। যথা—আউস, আমন ও বোরো। অমন ধানই সবচেয়ে ভাল। আমন ধানের চাষই পশ্চিমবঙ্গে বেশী হয়। ধান চাষের জন্য প্রচুর জলের দরকার হয়। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বর্ধমান, মেদিনীপুর চব্বিশ পরগণা, বীরভূম, বাঁকুড়ায় প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়। ধান থেকে চাল হয়। চাল দু'রকম। আতপ চাল ও সিদ্ধ চাল। চাল থেকে ভাত হয়। ধান থেকে খৈ, চিড়া হয়। চাল থেকে মুড়ি হয়। ধানের গাছকে খড় বলে। খড় গরু ও মোষের খাদ্য। খড় দিয়ে ঘরের ছাউনি হয়।

পাট

পাট বাংলার একটি অর্থকরী ফসল ও প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। পলি মাটিতে পাট ভাল জন্মে। বৈশাখ মাসে পাট বীজ বুনতে হয়। চারা-গুলি একটু বড় হলে জমির সব আগাছা তুলে ফেলতে হয়। পাট চাষে জলের খুব দরকার হয়। পাট গাছ ৫।৬ হাত লম্বা হয়। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে পাট গাছ কেটে আঁটি বেঁধে জলে পচতে দেওয়া হয়। ১৫।২০ দিন পরে পাটের ছাল বের করে ভাল করে জলে ধুয়ে পাট শুকোতে দেওয়া হয়। তারপর ঐ পাট বাজারে বিক্রি হয়। পাট থেকে দাঁড়, চট, থলে প্রভৃতি তৈরী হয়। পাট থেকে সৌখীন কাপড় তৈরী হয়। পাট পাতা শাক হিসাবে অনেক খায়। পাট কাঠি জ্বালানি হিসাবে অনেকে ব্যবহার করে। পাটপচা জল স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। এই জল থেকে মশার বৃদ্ধি হয়।

লোহা

লোহা একটি প্রয়োজনীয় কঠিন খনিজ পদার্থ। খনি থেকে লোহা তুলে আগুনে গলিয়ে নানা কাজে ব্যবহার করা হয়। লোহা তিন প্রকারের যথা—ঢালা, পেটা ও ইস্পাত। পৃথিবীর সব দেশেই লোহার খনি আছে। দুর্গাপুর, বার্ণপুর, কুলটি, ভিলাই, রাউরকেল্লা, জামসেদপুর প্রভৃতি স্থানে বিরাট লোহার কারখানা আছে। লোহা থেকে খুঁটি, রেলিং, কড়ি, বরগা, জানালার গরাদ, হাতা, কড়া, খুন্তি, ছুরি, কাঁচি, কোদাল, লাঙ্গলের ফাল, কাটারি, কামান, বন্দুক, রেল, মোটর, সাইকেল, রিক্সা, জাহাজ, ষ্টীমার প্রভৃতি তৈরী হয়। লোহা না হলে মানুষের একদিনও চলে না।

কয়লা

কয়লা একটি নিত্য প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ। হাজার হাজার বছর আগে ভূমিকম্পে বড় বড় বন মাটির তলায় চাপা পড়ে যায়। পরে ইহা কয়লায় পরিণত হয়। মাটির তলায় কয়লা স্তরে স্তরে সাজান থাকে মাটির নীচে সুড়ঙ্গ কেটে কয়লা সংগ্রহের জন্য মানুষ অগ্রসর হয়। খনির ভিতর খুব অন্ধকার সেজন্য খনির মধ্যে সেফটি ল্যাম্প নামে এক প্রকার বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহার করা হয়। এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে খনি থেকে কয়লা তোলা হয়। রাণীগঞ্জ, আসানসোল, বরাকর, গিরিডি, সীতারামপুর, ঝরিয়া, হাজারিবাগ প্রভৃতি স্থানে কয়লার খনি আছে। কয়লা দু প্রকার—কাঁচা কয়লা ও পোড়া কয়লা। রান্নার কাজে পোড়া কয়লা ব্যবহার করা হয়। কাঁচা কয়লায় কল-কারখানা, রেলগাড়ী, ষ্টীমার, জাহাজ প্রভৃতি চলে। কয়লা থেকে গ্যাস তৈরী হয় এবং ঐ গ্যাস থেকে রাস্তার আলো জ্বালান হয় ও রান্না হয়। কয়লা থেকে আলকাতরা, পিচ, রঙ, পেট্রোল, কেরোসিন, ফিনাইল, ন্যাপথালিন প্রভৃতি তৈরী হয়। কয়লার খনিতে মাঝে মাঝে হীরাও পাওয়া যায়।

কাগজ

কাগজ সভ্যতার বাহন ও জ্ঞান বিস্তারের সহায়ক। অতি প্রাচীন কালে কাগজের প্রচলন ছিল না। তখন লোকে তালপাতায়, ভূর্জ পত্রে, পশুর চামড়ায়, কাঠে ও পাথরে লিখত। প্রায় দু হাজার বছর পূর্বে সর্বপ্রথম চীনদেশ কাগজ আবিষ্কার হয়। তারপর ভারতবর্ষে কাগজের প্রচলন হয়। সবশেষে আরব ও ইউরোপে ইহার প্রচলন হয়।

ছিন্ন বস্ত্র, পাট, শণ, খড়, চট, বাঁশ, ঘাস ইত্যাদি প্রথমে গুঁড়া করা হয়। পরে উহাতে গরম জল মিশাইয়া মণ্ড প্রস্তুত হয়। ঐ মণ্ড লোহার ছাকনির উপর ঢালিয়া শুষ্ক করলে কাগজ প্রস্তুত হয়। মণ্ডের সঙ্গে রং মেশালে রঙীন কাগজ প্রস্তুত হয়। মেষ ও ছাগলের চামড়া পরিষ্কার করে পার্চমেণ্ট কাগজ প্রস্তুত হয়। ঐ প্রকার কাগজ থেকে নোট ছাপা হয় এবং বাড়ীর দলিল প্রভৃতি লেখবার কাজে ব্যবহার করা হয়।

ফুলস্কাপ, ডবল ফুলস্কাপ, ক্রাউন, ডবল ক্রাউন, রয়্যাল, ডিমাই প্রভৃতি অনেক আকারের কাগজ আছে। লেখার ও বই ছাপার জন্য কাগজ অতি প্রয়োজনীয়। সংবাদ পত্র, পোষ্ট কার্ড. খাম, ডাকটিকিট, ব্যাংকের চেক, খাতা, মোড়ক, পেটি, বাক্স প্রভৃতি কাজে বিভিন্ন প্রকার কাগজ ব্যবহৃত হয়।

কাগল আবিষ্কারের ফলে মানব সভ্যতা দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে।

গ্রীষ্মকাল

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এ দুমাস গ্রীষ্মকাল। ইহা বৎসরের প্রথম ঋতু। এ সময় সূর্যের কিরণ প্রখর হয়। দিন বড় ও রাত্রি ছোট হয় এবং প্রচণ্ড গরম পড়ে। সূর্যের প্রখর তাপে পুকুর, খাল, বিল প্রভৃতি শুকিয়ে যায়। স্থানে স্থানে ভীষণ জলকষ্ট উপস্থিত হয়। গাছপালা সূর্যের প্রখর তাপে শ্রীহীন হয়ে পড়ে। বিকালের দিকে মাঝে মাঝে ঝড় ও বৃষ্টি হয়।

এই সময় আম, লিচু, ফুটি, তরমুজ, কাকুর, খেজুড় প্রভৃতি ফল

পাওয়া যায়। বেল, চাঁপা, জুঁই, টগর, গন্ধরাজ প্রভৃতি নানারকম ফুল ফোটে। চাষীরা মাঠে আউস ধান ও পাট বোনে।

এই সময় মশার উপদ্রব বৃদ্ধি পায়। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

বর্ষাকাল

আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দু মাস বর্ষাকাল। এ সময় আকাশ সব সময় মেঘে ঢাকা থাকে। কখনও বা মুষলধারায়, কখনও বা ঝির ঝির করে বৃষ্টি হয়। পুকুর, খাল, বিল, নদী, নালা জলে ভরে যায়। গাছপালা শ্যামল শ্রীধারার্ণ করে। চাষীরা আমন ধানের চাষ করে। এই সময় কাঁঠাল, আনারস ও তাল পাওয়া যায়। জুঁই, চামেলী, কেয়া কদম প্রভৃতি ফুল ফোটে। গাছপালা সতেজ হয়।

অত্যধিক বর্ষার ফলে বন্যা দেখা দেয়। শস্যের ক্ষতি হয়। মানুষ ও জীবজন্তুর মৃত্যু হয়। গ্রামের লোকের দুর্দশার সীমা থাকে না।

আমাশয়, উদারাময়, ম্যালেরিয়া, সর্দি, কাশি ও জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। সাপ, বিছা, জোঁক, ব্যাঙ ও কীটপতঙ্গের উপদ্রব বাড়ে। বর্ষাকাল অপকারের তুলনায় উপকারই বেশী করে থাকে।

শরৎকাল

ভাদ্র ও আশ্বিন এই দুমাস শরৎকাল। শরতের শোভা অতিশয় মনোরম, তাই একে ঋতু রাণী বলা হয়। শরৎকালে আকাশ বেশ পরিষ্কার থাকে। নদ, নদী, খাল, বিল, পুকুর প্রভৃতি জলে পূর্ণ থাকে ধান গাছে মাঠ ভরে থাকে। পদ্ম, স্থলপদ্ম, শেফালি, কাশ, শিউলি,

কুমুদ, কদম প্রভৃতি ফুল ফোটে। এই সময় বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা হয়। স্কুল, কলেজে, অফিস, আদালত প্রভৃতি বন্ধ থাকে। শরৎকাল থেকে শিশির পড়তে শুরু করে। শরৎকালে সর্দি, কাশি, নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগ দেখা যায়।

হেমন্তকাল

কার্তিক ও অগ্রহায়ণ এ দু মাস হেমন্তকাল। এ সময় আকাশ পরিষ্কার থাকে। মাঠে মাঠে ধান পেকে ওঠে। এ সময় পল্লীগ্রামে নবান্ন উৎসব হয়। হেমন্তকালে কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা, কালী পূজা ভাই ফোঁটা, কার্তিক পূজা, জগদ্ধাত্রি পূজা প্রভৃতি হয়। এই সময় অল্প ঠান্ডা পড়তে থাকে। দিন ছোট ও রাত্রি বড় হয়। কপি, টমাটো কড়াইশুটি, বেগুন, পালং, সিম, মুলা, আলু প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এ সময় টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি অসুখ হয়।

শীতকাল

পৌষ ও মাঘ এ দু মাস শীতকাল ; এই সময় উত্তর দিক থেকে ঠান্ডা বাতাস বইতে থাকে। মাঝে মাঝে সকাল বেলায় কুয়াশা দেখা যায়। এ সময় কনকনে শীত পড়ে। এই সময় শিউলি, আমড়া, অশ্বথ, বেল প্রভৃতি গাছের পাতা ঝরে যায়। এ সময় আম গাছে মুকুল ধরে। কনকনে ঠান্ডায় হাত পা ও ঠোঁট ফেটে যায়। এ সময় ছাত্র-ছাত্রীদের প্রধান উৎসব সরস্বতী পূজা হয়। এই সময় খেজুর রস ও খেজুর গুড় পাওয়া যায়। কমলালেবু, নারকেল, কুল, পেয়ারা, আপেল, নেসপাতি, আঙুর প্রভৃতি ফল এবং আলু, বেগুন, মুলা, কপি, টমাটো, কড়াইশুটি, লাউ, পালং, সিম, বিট, গাজর, শালগম

প্রভৃতি শাক সবজি উৎপন্ন হয়। গাঁদা, ডালিয়া, গোলাপ প্রভৃতি ফুল ফোটে। শীতকালে পরিশ্রম করলে শরীর ক্লান্ত হয় না। এ সময় ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং ভাল ঘুম হয়। পোষাক-পরিচ্ছদ ও বিছানার অভাবে অনেকে খুব কষ্ট পায়। এ সময় খোস, পাঁচড়া, সর্দি, কাশি প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়।

বসন্তকাল

ফাল্গুন ও চৈত্র এ দু মাস বসন্তকাল। এ সময় শীত কমে যায়। দক্ষিণ দিক থেকে মলয় বাতাস বয়। গাছে গাছে নতুন পাতা বের হয়। বসন্তের শোভা বড় মনোরম তাই একে ঋতুরাজ বলা হয়। এ সময় কোকিলের কুহু কুহু ধ্বনি শোনা যায়। অশোক, বকুল, মাধবী, মল্লিকা, চাঁপা, গন্ধরাজ প্রভৃতি ফুল ফোটে। কাঁচ আম, সজিনার ডাঁটা, ফুটি, তরমুজ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। নূতন আখের গুড় পাওয়া যায়। এ সময় দোলযাত্রা, শিবচতুর্দ্দশী, অন্নপূর্ণা পূজা প্রভৃতি উৎসব হয়। এ সময় কলেরা বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব হয়।

দুর্গাপূজা

বাঙালীদের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। শরৎকালে এই পূজা হয়। দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রায় একমাস স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত প্রভৃতি বন্ধ থাকে। নূতন জামা, প্যাণ্ট, কাপড়, ধুতী প্রভৃতি পরে ছেলেমেয়েরা পূজার মণ্ডপে ঘুরে বেড়ায়।

দুর্গা প্রতিমা দেখতে খুব সুন্দর। দেবী দুর্গা তাঁর দশ হাতে দশ রকম অস্ত্র নিয়ে সিংহের উপর দাঁড়িয়ে মহিষাসুরকে বধ করেছেন।

তাঁর ডান দিকে থাকেন সম্পদের দেবী লক্ষ্মী ও সিদ্ধিদাতা গণেশ এবং বাম দিকে থাকেন বিদ্যার দেবী সরস্বতী ও দেব সেনাপতি কার্তিক। গণেশের পাশে থাকে কলাবউ। উপরে চালচিত্রে মহাদেব ও তেত্রিশ কোটী দেব-দেবতার মূর্তি আঁকা থাকে।

আশ্বিন মাসে শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে দেবীর বোধন হয়। সপ্তমী তিথি থেকে পূজা আরম্ভ হয়। অষ্টমী ও নবমীতিথির মিলন ক্ষণে যে পূজা হয় তাকে সন্ধি পূজা বলে। এই পূজায় অনেক জায়গায় বলিদানের প্রথা আছে। নবমীর পরদিনই, দশমী পূজা। ঐ দিন সন্ধ্যায় খুব ধুমধাম করে দেবীকে বিসর্জন দেওয়া হয়। বিসর্জনের পর প্রত্যেকে গুরুজনদের প্রণাম, ছোটদের আশীর্বাদ ও বন্ধুদের আলিঙ্গন করে।

সরস্বতীপূজা

সরস্বতী বিদ্যা ও সঙ্গীতের দেবী বলে ছাত্র-ছাত্রীদের এই পূজার আনন্দ সবচেয়ে বেশী। মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এই পূজা হয়। দেবী দ্বিভূজা শ্বেত বর্ণা। শ্বেত পদ্ম তাঁর আসন, হস্তে তাঁর বীণা ও পুস্তক। রাজহংস তাঁর বাহন। স্কুল, কলেজ, ক্লাব, লাইব্রেরীতে এই পূজা হয়। পূজার শেষে অঞ্জলি দিয়ে প্রসাদ ভক্ষণ করা হয়। কোন কোন বিদ্যালয়ে মাধ্যহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা থাকে। সন্ধ্যায় দেবীর আরতি হয়। আরতির পর কোন কোন স্থানে গান, বাজনা ও অভিনয় অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। পরদিন সন্ধ্যায় শোভাযাত্রা করে দেবীকে বিসর্জন দেওয়া হয়।

আমাদের বিদ্যালয়

আমাদের বিদ্যালয়ের নাম পূর্ণচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়। ইংরাজী ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছে। বিদ্যালয়টি হুগলী জেলায় শ্রীরামপুর শহরের ঠাকুরদাস বাবু লেনের উপর অবস্থিত। বিদ্যালয় বাড়ীটি দুতলা। বিদ্যালয়ে জলের কল, বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার ব্যবস্থা আছে। আমি এই বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করি। আমাদের বিদ্যালয়টি অবৈতনিক। বিদ্যালয়ের মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৪৫৯ জন। আমাদের বিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফল প্রতি বছর বেশ ভাল হয়। আমরা শুধু পড়াশুনা নিয়ে থাকি না। প্রজাতন্ত্র দিবস, স্বাধীনতা দিবস, সরস্বতীপূজা, মহাপুরুষদের জন্ম ও মৃত্যু দিবস আমরা উদ্‌যাপন করি। আমরা কবিতা আবৃত্তি করি, জীবনী আলোচনা করি। আমাদের বিদ্যালয়ের কাজ সকাল ১১টায় আরম্ভ হয় এবং ৩টা ৩০ মিনিটে শেষ হয়। মাঝখানে আমরা আধঘণ্টা টিফিনের ছুটি পাই। বিদ্যালয়ের সামনে একটি মাঠ আছে। টিফিনের সময় আমরা সেখানে খেলা করি। বিদ্যালয়টিকে আমি খুব ভালবাসি।

তোমার প্রিয় খেলা

ফুটবল খেলা আমার কাছে খুব প্রিয়। ফুট অর্থ পা দিয়ে খেলা হয় বলে এই খেলাকে ফুটবল খেলা বলে। গ্রীষ্মকাল থেকে শুরু করে হেমন্তকাল পর্যন্ত এই খেলা হয়। ফুটবল খেলায় ১১ জন করে দু'দলে ২২ জন খেলোয়াড় থেকে। মাঠের দু প্রান্তে দুটি গোলপোষ্ট থাকে। ঐ গোল পোষ্টের মধ্যে পা দিয়ে বল ঠেলে দিতে পারলে

গোল হয়। যে দল বেশী গোল দিতে পারে সেই দলই খেলায় জেতে। এই খেলা যিনি পরিচালনা করেন তাঁকে রেফারী বলা হয়। তিনি বাঁশী বাজিয়ে এই খেলা পরিচালনা করেন। সাধারণতঃ ত্রিশ মিনিট খেলা চলার পর পাঁচ মিনিটের বিরতি হয় এবং তারপর আরো ত্রিশ মিনিট খেলা চলে। গোলরক্ষক ছাড়া আর কেউ হাত দিয়ে বল ধরতে পারে না।

ফুটবল খেলা খুব আনন্দদায়ক। এই খেলায় শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা হয়।

একটি মেলার বর্ণনা

কোন পূজা বা উৎসবকে কেন্দ্র করে নানা রকম জিনিসপত্রের যে দোকান বসে তাকে মেলা বলে। শ্রীরামপুরের মাহেশের রথের মেলা খুব প্রসিদ্ধ। ইতিহাস প্রসিদ্ধ এ মেলাটি বহুদিন ধরে হয়ে আসছে। জগন্নাথদের স্নান যাত্রার দিন থেকে এ মেলা বসতে শুরু করে। এক মাসেরও বেশী এ মেলা থাকে। মাহেশের মাসির বাড়ীর আগে থেকে শ্রীরামপুরের রাধাবল্লভের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার দুধারে রকমারী জিনিসের দোকান বসে। রথের দিন ও উল্টোরথের দিন লক্ষ লক্ষ নরনারী ও শিশুর ভিড় হয়। ভিড়ের চাপে অনেক অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই মেলায় শিশুদের প্রধান আকর্ষণ তালপাতার বাঁশী, পাঁপড় ভাজা বাদাম ভাজার দিকে। অনেক সার্কাস দেখে ও নাগর দোলায় চড়ে আনন্দ উপভোগ করে। বড়রা নান রকম জিনিস ও ফুল-ফলের গাছ কিনে নিয়ে যান। আমিও বাবা-মার সঙ্গে এই মেলা দেখতে যাই। এই মেলা খুব আনন্দদায়ক। মাঝে মাঝে বৃষ্টি এসে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি করে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১৮২০ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বংশে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মায়ের নাম ভগবতী দেবী। ছোটবেলা থেকেই তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান এবং একগুঁয়ে ছিলেন। ন'বছর বয়সে গ্রামের পাঠশালার পড়া শেষ করে বাবার সঙ্গে কলকাতায় এসে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়। কলকাতা আসবার সময় রাস্তার মাইল পাথরের লেখা দেখে তিনি ইংরাজী সংখ্যা শেখেন। তাঁকে দুবেলা রান্না করে পড়াশুনা করতে হত। রাতে আলোর অভাবে রাস্তায় গ্যাসের আলোয় তাঁকে পড়তে হত। তবুও প্রতি পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করতেন। অগাধ পাণ্ডিত্যের জনা মাত্র কুড়ি বছর বয়সে "বিদ্যাসাগর" উপাধি লাভ করেন। বিদ্যাশিক্ষার পর তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক হন। পরে কিছুদিন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের কাজ করে বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শকের কাজ করেন। শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেক বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপন করেন। বইয়ের অভাব দূর করবার জন্য তিনি বর্ণ পরিচয় প্রথমভাগ, দ্বিতীয়ভাগ হতে শুরু করে আখ্যান মঞ্জরী, সীতার বনবাস, শকুন্তলা, বোধোদয়, কথামালা, ব্যাকরণ কৌমুদী ও তার উপক্রমণিকা প্রভৃতি বহু বই লেখেন। তিনি হিন্দু সমাজে বহু বিবাহ বন্ধ করেন এবং বিধবা বিবাহ প্রচলন করেন। কত গরীব দুঃখীকে তিনি সাহায্য করেছেন। কত আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দিয়েছেন। কত কন্যাদায় গ্রস্তকে অর্থ সাহায্য দিয়ে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করেছেন। মধুসূদনের কবি প্রতিভাকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য

করেছেন। বাবা ও মাকে দেবদেবীর মত ভক্ত করতে বলেছেন। ১৮৯১ সালের ২৯শে জ্বলাই তাঁর মৃত্যু হয়।

রবীন্দ্রনাথ

১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ কলিকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মায়ের নাম সারদা দেবী। রবীন্দ্রনাথ চার বছর বয়সে উপযুক্ত শিক্ষকবৃন্দের তত্বাবধানে বাড়ীতে লেখাপড়া শুরু করেন। আট বছর বয়সে তিনি কলিকাতার নর্মাল স্কুলে ভর্তি হন। পরে ওরিয়েণ্টাল সেমিন্যারী ও সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে শিক্ষা লাভ করে বাবার কাছে বোলপুরে যান। সেখানে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা করেন। তারপর ইংলণ্ডে গিয়ে ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষা করেন। ছোট বয়স থেকেই তিনি কবিতা, গল্প, কাব্য, প্রবন্ধ ও নাটক প্রভৃতি লিখতে শুরু করেন। শিশুদের জন্যেও তিনি অনেক বই লিখে গেছেন। সারা জীবনে তিনি কত গান, গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি লিখে গেছেন তার সংখ্যা নেই। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে গীতাঞ্জলী ইংরাজীতে অনুবাদ করে তিনি নোবেল প্রাইজ লাভ করেন।

দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি বোলপুরে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন আশ্রম স্থাপন করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ দার্শনিক ও দেশপ্রেমিক ছিলেন। তিনি বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তিনি ১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ২৩শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র উড়িষ্যার কটক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম জানকীনাথ বসু ও মায়ের নাম প্রভাবতী দেবী। সুভাষচন্দ্রের বাবা কটকের সরকারী উকিল ছিলেন। চব্বিশ পরগণা জেলার কোদালিয়া গ্রামে তাঁদের আদি বাসস্থান ছিল। কলকাতার ভবানীপুর এলাকায় এলগিন রোডের বাড়ীতে সুভাষচন্দ্রের পরিবারবর্গ বাস করতেন।

কটকের মিশনারী স্কুলে তাঁর প্রথম শিক্ষা শুরু হয়। তারপর রাফেনস্ কলিজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তারপর প্রেসিডেন্সী কলেজ ও পরে স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে যথাক্রমে আই. এ ও বি, এ পাশ করেন। তারপর তিনি আই, সি, এস পরীক্ষা দিতে বিলাত যান এবং পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। দেশে ফিরে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি বহুবার কারাবরণ করেন। তিনি দুবার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন। কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়রও হয়েছিলেন। ফরওয়ার্ড ব্লক নামে কংগ্রেসের একটি নূতন দল গঠন করেন। এই সময় তিনি বাড়ীতে সরকারের কড়া পাহারার মধ্যে থাকতেন। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। তখন তিনি গোপনে বাড়ী থেকে জাপানে যান। সেখানে তিনি আজাদ্ হিন্দ বাহিনী গঠন করে ভারতের দিকে অগ্রসর হন। আসামের কতক অংশ দখল করেন। সেই সময় জাপানের পতন হয়। তখন তিনি জাপান রওনা হন। পথে এক দুর্ঘটনায় তিনি আহত হন। এই দুর্ঘটনায় তিনি মারা গেছেন বলে ইংরেজ সরকার ঘোষণা করেন। ভারতবাসীর কাছে তিনি চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ২৪শে জানুয়ারী কলকাতার সিমলার দত্ত পরিবারে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম হয়। তাঁর আসল নাম নরেন্দ্র নাথ দত্ত। তাঁর বাবার নাম বিশ্বনাথ দত্ত এবং মায়ের নাম ভুবনেশ্বরী দেবী।

পাঁচ বছর বয়সে তাঁর শিক্ষা আরম্ভ হয়। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি জেনারেল য়্যাসেম্বলি কলেজ থেকে দর্শন শাস্ত্রে বি, এ পাশ করেন। লেখাপড়া ছাড়া গান-বাজনা, খেলাধুলা প্রভৃতি বিষয়ে খুব পারদর্শী ছিলেন। এই সময় ভগবানের স্বরূপ জানবার তাঁর তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মে। এক বন্ধুর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য হন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। দীক্ষার পর তাঁর নাম হয় বিবেকানন্দ।

হিন্দু ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করেন। আমেরিকায় শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় বক্তৃতা দিয়ে হিন্দু ধর্মের প্রধান বিষয়বস্তু সকলকে শোনান।

দীন-দরিদ্রের সেবার জন্য তিনি ভারতে বিভিন্ন স্থানে "রামকৃষ্ণ মিশন" নামে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

তাঁর কর্মময় জীবনের একটি মুহূর্তও আলস্যে অতিবাহিত হয় নাই। তিনি বলতেন, "জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" ইহাই ছিল তাঁহার সেবার মূল কথা।

অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই বেলুড়ে তিনি দেহত্যাগ করেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর কলকাতার ভবানীপুরে চিত্তরঞ্জন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ভুবনমোহন দাস ও মাতার নাম নিস্তারিণী দেবী।

তাঁর বাল্যশিক্ষা গৃহেই আরম্ভ হয়। তারপর ভবানীপুরের লণ্ডন মিশনারী স্কুলে ভর্তি হন। সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে বি, এ পাশ করে আইন পরীক্ষা দেবার জন্য বিলাত গমন করেন। ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় প্রশংসার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় এসে হাইকোর্টে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন।

কোন দুষ্ট ব্যক্তির চক্রান্তে পিতার ঋণের দায়ে তাঁকে বাধ্য হয়ে দেউলিয়া খাতায় নাম লেখাতে হয়েছিল। পরে তিনি পিতার সব ঋণ শোধ করেছিলেন।

নানা সৎকাজে, দুর্ভিক্ষে, কন্যাদায়ে তিনি সহস্র সহস্র টাকা দান করেছেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হন এবং পরে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। দেশের সেবার জন্য তিনি বহুবার কারাবরণ করেন। তিনি 'নরনারায়ণ' নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর রচিত 'সাগর সঙ্গীত' ও 'মালঞ্চ' তাঁর সাহিত্য সেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দেশবাসীর সেবায় তিনি তাঁর বাড়ীটি পর্যন্ত দান করে গেছেন। চিত্তরঞ্জন সেবা সদন তাঁর বাড়ীর উপরই নির্মিত। দীর্ঘদিন অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়। স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কিছুদিন সপরিবারে দার্জিলিং শৈলাবাসে অবস্থান করেন। সেখানেই ১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন তাঁর মৃত্যু হয়।

মহাত্মা গান্ধী

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর গুজরাটের পোরবন্দরে গান্ধীজীর জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম কাবা গান্ধী, মায়ের নাম পুতলী বাঈ। গান্ধীজীর পুরো নাম মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী। বাল্যকাল থেকে তিনি সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি প্রথমে রাজকোটের বিদ্যালয়ে পড়া শুরু করেন। সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ব্যারিষ্টারী পড়তে বিলাত যান। কয়েক বছর পরে ব্যারিষ্টারী পাশ করে দেশে ফিরে আসেন। তিনি প্রথমে বোম্বাই হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। সেখান থেকে তিনি আফ্রিকায় যান। সেখানে ভারতীয়দের লাঞ্ছনা দেখে তিনি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর চেষ্টায় সেখানকার 'কালা আদমীর দুঃখ দূর হয়।

দেশে ফিরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ করেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি বহুবার কারাবরণ করেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। অবশেষে তাঁরই নেতৃত্বে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ইআগষ্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে।

তিনি সত্য অহিংসার চির উপাসক ছিলেন। তিনি নিতান্ত দীন দরিদ্রের ন্যায় দিন কাটাতেন। তিনি আমেদাবাদে 'সবরমতী আশ্রম" স্থাপন করে নিজ হাতে কুষ্ঠ রোগীদের সেবা করতেন। হরিজনদের উন্নতির জন্য আজীবন চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে মহাত্মা উপাধি দেন। আমরা তাঁকে "জাতীয় জনক বাপুজী" বলি। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে জানুয়ারী দিল্লীর প্রার্থনা সভায় নথুরাম গড়সে নামক এক আততায়ীর গুলিতে তিনি নিহত হন।

মহরম

মহরম মুসলমানদের একটি প্রধান পর্ব্ব। আরবদেশে কারবালার যুদ্ধক্ষেত্রে হজরত ইমাম হোসেনের বিষাদময় মৃত্যুকে স্মরণ করার জন্য প্রতি বছর এই পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আসলে এটি শোকের পর্ব্ব। মুসলমানদের মধ্যে সিয়া ও সুন্নী নামে দুটি দল আছে। সিয়ারা এই পর্বে আনন্দ করে ও সুন্নীরা দুঃখ প্রকাশ করে।

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের পুত্র ছিল না। তাঁর একমাত্র কন্যা ফতেমা বিবির দুই পুত্র ছিল। তাদের নাম হাসান ও হোসেন। হাসান মদিনার সিংহাসনে বসেন। কিন্তু দামাস্কাস শহরের শাসন কর্তা হাসানের প্রাধান্য স্বীকার করল না। ফলে উভয়ের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হল। অবশেষে এজিদ বিষ প্রয়োগে হাসানকে হত্যা করে। তখন মদিনায় থাকা নিরাপদ নয় মনে করে হোসেন অল্প মাত্র সৈন্য নিয়ে কুফা নগরের দিকে যাত্রা করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ পথ হারিয়ে কারবালার প্রান্তরে উপনীত হন। তখন এজিদ বহু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে কারবালায় এসে হোসেনের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। এই যুদ্ধে এজিদ পরাজিত হলেন। হোসেন পিপাসায় কাতর হয়ে প্রাণ-ত্যাগ করেন।

সে জন্য মুসলমানরা প্রতি বছর মহরম মাসে শুক্লপক্ষের প্রথম দিন থেকে দশ দিন পর্যন্ত শোক প্রকাশ করেন। হোসেনের আত্মার শান্তির জন্য স্থানে স্থানে কোরাণ পাঠ করেন। এই সময়ে মুসল-মানরা অস্ত্রশস্ত্র ও লাঠি নিয়ে নকল যুদ্ধাভিনয় করেন। তাজিয়া নিয়ে বাজনা বাজিয়ে মিছিল করে সকলে যায়। কেউ কেউ "হাসান হোসেন

কারবালা" বলে বুক চাপড়িয়ে শোক প্রকাশ করে। পর্বের শেষে তাজিয়া বিসর্জন দেওয়া হয় এবং গরীব দুঃখীদের খাদ্য ও অর্থ দান করা হয়।

হাজী মহম্মদ মহসীন

১৭৩২ সালে হুগলী শহরে হাজী মহম্মদ মহসীন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ফৈজুল্লা। বাল্যকালে এক মৌলোভীর কাছে তিনি আরবী ও পার্শী ভাষা শিক্ষা করেন। ধর্মগ্রন্থ পড়তে তিনি খুব ভালবাসতেন। ফলে ধর্মে অনুরাগ জন্মে। ১৭৬২ সালে তিনি তীর্থ পর্যটনে বের হন। আরব, পারস্য, মিশর, তুর্কীমান এবং ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। শেষে মক্কা ও মদিনা গমন করে হাজি উপাধি লাভ করেন। তিনি ফকিরের মত জীবন-যাপন করতেন। তিনি বিবাহ করেন নাই। হুগলীর ইমামবাড়া, হুগলী কলেজে এবং কলকাতার মাদ্রাসা তার অক্ষয় কীর্তি। দীন, দরিদ্র, অনাথ, আতুরকে তিনি মুক্ত হস্তে দান করতেন। এক লক্ষ ছাপান্ন হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি তিনি মুসলমানদের শিক্ষার জন্য দান করেন। তাঁর প্রদত্ত আয় হতে অনেক মুসলমান ছাত্র সাহায্য পেয়ে থাকে।

তিনি খুব পরোপকারী ও দানশীল ছিলেন। তাঁর মত কোমল হৃদয় ও দেব চরিত্রের লোক জগতে বিরল। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

আমাদের গ্রাম

আমরা যে গ্রামে বাস করি তার নাম চণ্ডুলী। ইহা বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। গ্রামের উত্তর দিক দিয়ে ব্রাহ্মণী নদী প্রবাহিত! এই গ্রামের

মধ্যে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি উচ্চ বিদ্যালয় ও একটি ডাকঘর আছে। প্রত্যহ সকালে গ্রামের মধ্যে একটি বাজার বসে। এই গ্রামে সর্বশ্রেণীর লোক বাস করে। এখানে কোন ভাল চিকিৎসক নাই। গ্রামের রাস্তাগুলি কাঁচা। বর্ষাকালে কাদায় ভরে যায়। সম্প্রতি গ্রামে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা হয়েছে। এই গ্রামের সবচেয়ে বড় উৎসব নবান্ন। নবান্নের মত এত ধুমধাম কোন উৎসব হয় না। দুর্গাপূজার সময় গ্রামের মধ্যে দু'চারদিন যাত্রা, থিয়েটার হয়। এই গ্রাম আমার জন্মভূমি। ইহার মাটি, জল ও বায়ুতে আমি মানুষ হয়েছি। এই গ্রামখানি আমার খুব ভালো লাগে। মনে হয় এমন শান্তির জায়গা পৃথিবীতে আর কোথাও নাই।

তোমাদের বিদ্যালয়ের একটি উৎসব

বাংলার ২৫শে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন। ঐ দিন প্রতি বছর আমরা আমাদের বিদ্যালয়ে কবিগুরুর জন্মদিন মহা-সমারোহের সঙ্গে পালন করি।

পঁচিশে বৈশাখের ভোরে আমরা বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে উপস্থিত হই। রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে আমরা সারা শহর পরিভ্রমণ করে বিদ্যালয়ে ফিরে আসি। কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করি, ধূপধুনা দিই এবং প্রদীপ জ্বালি। কবিকে প্রণাম করে বাড়ী ফিরে আসি।

আবার বিকাল পাঁচটায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে উপস্থিত হই। আমাদের মধ্যে কেউ রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়, কেউ রবীন্দ্র কবিতা আবৃতি করে। শেষে আমরা কবিগুরুর রচিত একটি নাটক অভিনয় করে বাড়ী ফিরে আসি।